মধ্যবিত্ত

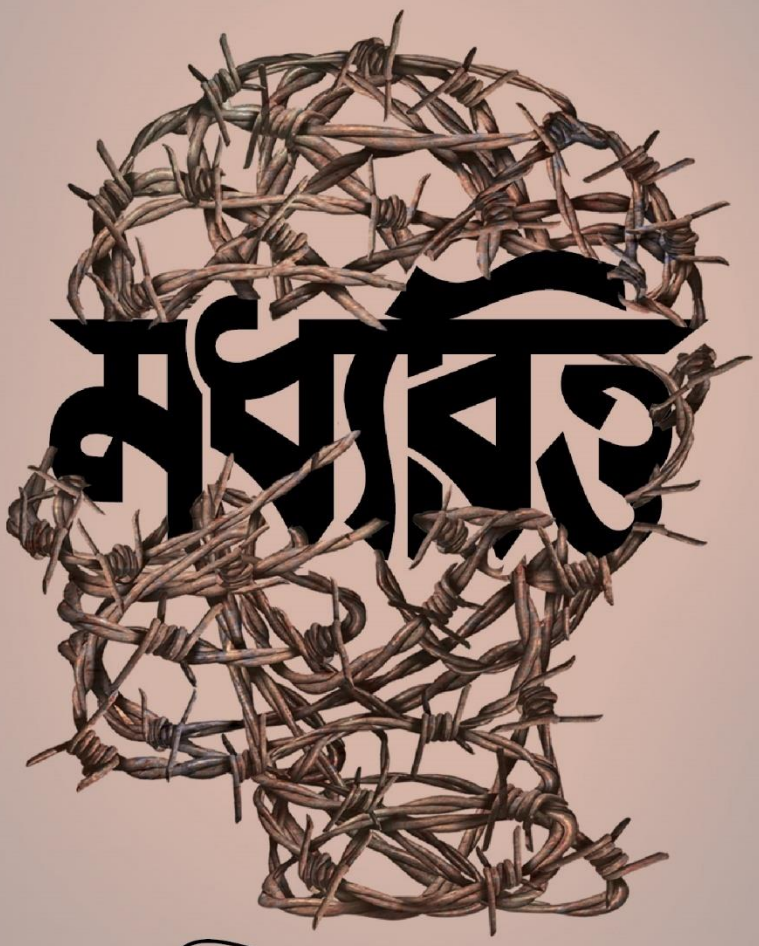

কিঙ্কর আহ্সান

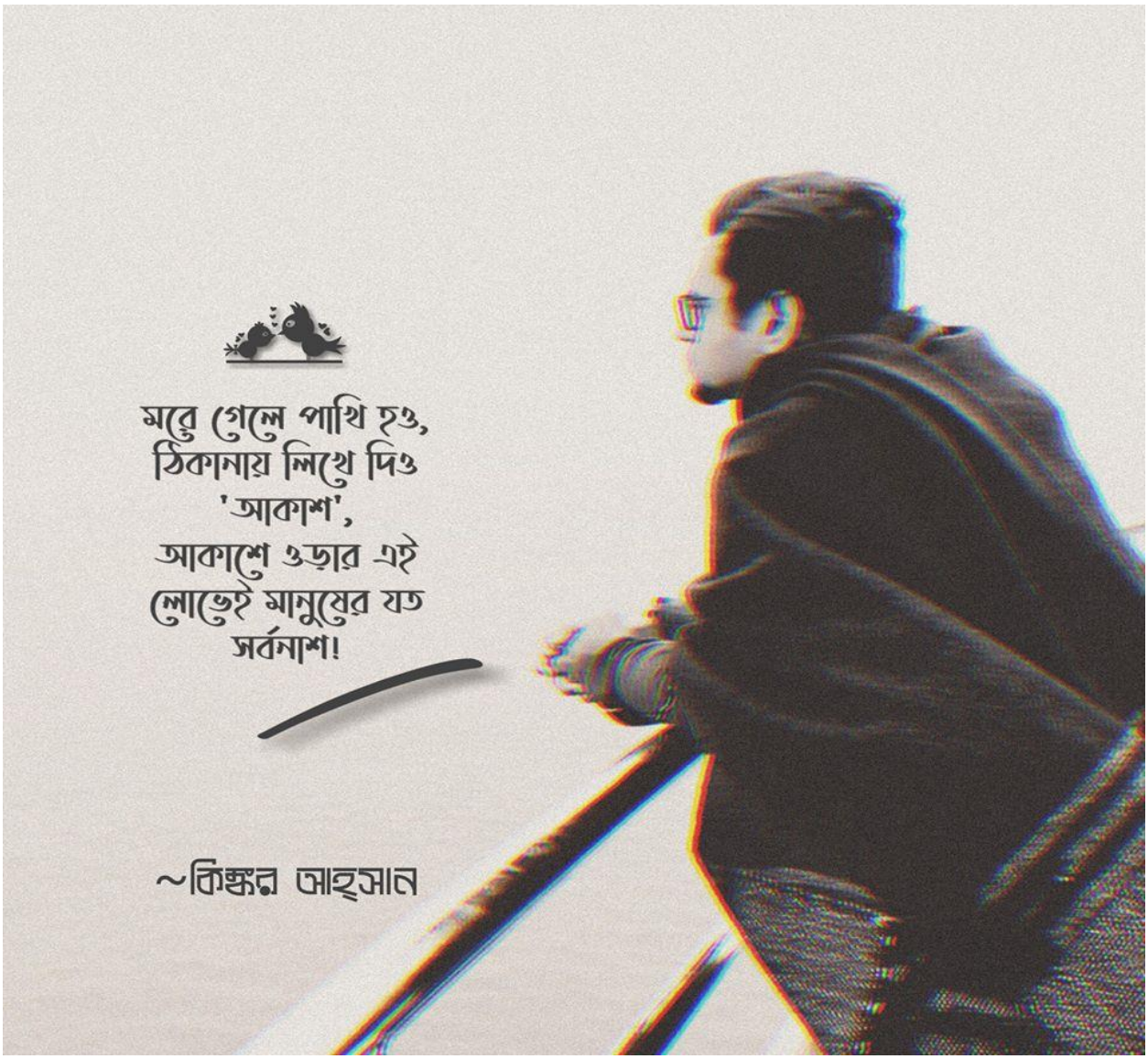

ফ্ল্যাপের লেখা:

মায়ের গ্রামটার কথা ভাবি। ভাসা ভাসা স্মৃতি। আধবোঝা চোখে গ্রামটাকে ভাবনায় দেখার অযথা চেষ্টা।
দেখি একটা নৌকার গলুইতে পানি উঠছে। ঘুড়িটা কাটা পড়ে। একটা গরু পানিতে নেমে পড়ে। একটা ন্যাংটো শিশু। মালাই, মালাই। কচি ডাবে দায়ের কোপ। কয়লায় ঝকঝকে দাঁত। খেচইন জালে আটকে পড়া কচুরিপানা-চিংড়ি। পায়রার বাক বাক বাকুম। টক আমড়া। কাটা কলাগাছ। নদীতে ঝাঁপ। চোর কাটা। চুলকানি। গায়ে কাঁদা। গলে যাওয়া সাবান। কাঁচা খেজুর। কানে পানি। পান-চুন- জর্দা। আখের শক্ত পেলব শরীর। ভাঙা পুকুর ঘাট। বড়ই। গাবের কষ। নীল ফুল। মাগুর মাছ। আমৃত্তি। পিয়াজু। দানাদার। বাছা চাল। মুরগির আদার। কেরোসিন। বাজার সদাই। ঠান্ডা-কাশি-সিকনি। মেজবান। সূর্য ডোবে। হ্যাজাক লাইট। নতুন ইমামের আযান। ডালে সুরুৎ করে চুমুক। গাতকের গান, 'মরি গেলি আর আইবা না...।'
এই তো গ্রাম। মায়ের কাছে শোনা, আমার চোখে কিছুটা দেখা গ্রাম। সে গ্রামে যাব।
মাকে রেখে আসব। মায়ের গ্রাম। মা ভালোই থাকবেন। আমরা কেমন থাকব?

মধ্যবিত্ত

কিঙ্কর আহ্‌সান

উৎসর্গ:

ফারজানা হক

আমার মধ্যবিত্ত বোন। তুই এত লক্ষী ক্যান?

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই:

উপন্যাস

মেঘডুবি
বিবিয়ানা
মখমলি মাফলার
রাজতন্ত্র
আঙ্গারধানি
রঙিলা কিতাব
মকবরা

বইমেলা ২০২১ এ আসতে উপন্যাস **'জলপরানি'**।

গল্পগ্রন্থ

কাঠের শরীর
স্বর্ণভূমি
আলাদিন জিন্দাবাদ

২০২১ এ আসছে গল্পগ্রন্থ **'বাঘবিধবা'**।

১.

কান্না, জল একটু ছাই,
সময় নিয়ে তাই পোড়াই।

মা জানেন তিনি আজ মারা যাবেন।
কোলকাতায় প্রচন্ড গরম। রাস্তার বাইরে দাড়িয়ে লেবুর শরবত খাচ্ছি।
ফুচকা খেয়েছিলাম একটু আগে। এক রুপিতে দুটো ফুচকা।
ফুচকার ভেতরে তেতুল আর মরিচের তৈরি বিশেষ রস। খুব ঝাল হলে হাতে তৈরি আলুর চিপসে্ ছোট্ট একটু কামড়। নেশা ধরে যায়। পেট ভরার জন্য দুপুর বেলা গোটা পনের ফুচকা খেলেই হল।
এদিকে কম দামে ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়। রাস্তার পাশে ভ্রাম্যমান দোকান তুলে বসে যায় ব্যবসায়ীরা। আমার জন্য সুবিধা। স্বাস্থ্য নিয়ে টেনশন নেই। ফিটফাট আছি। ওলট পালট খেলেও পেট ঠিক!
গত কয়েকটা দিন এসব খেয়েও সুস্থ আছি খুব। সকাল হলেই ডিম ভুনা, গরম ভাত। যে হোটেলে থাকি সেখানকার রসুইঘরে সবকিছুই ঝাল ঝাল রান্না হয়। ঝাল খেতে পারিনা।
আম খুব সস্তা এদিকে। কেজি মাত্র ত্রিশ রুপি। বারো মাসই এমন। দামে ওঠানামা নেই।
আম কিনে আনি। ঝাল এড়াতে আম দিয়ে ভাত খাই। দুটো আম ভাত দিয়ে মাখিয়ে খাবার পর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মাটির ঘটিতে গরম গরম দুধ চা। একদম ফ্রেশ।
কখনও কখনও অবশ্য থামস্ আপও খাওয়া হয়। ক্লোল্ড ড্রিংকস। একটু ভাব নিয়ে চুমুক!
দেশ ছাড়ার পর খাওয়ার ধরন বদলেছে। সাথে আসা বাবা, বড় মামা আর ছোট বোন রুবি বিপদে পড়লেও আমি মানিয়ে নিয়েছি। এই অবস্থায় আবদার চলেনা। মায়ের অসুস্থতার সময়ে মানিয়ে নিতেই হবে!
অপারেশন আজ। হুড়মুড়িয়ে গরম বাতাস আসছে। আমার ক্ষিধে কমেনা। টেনশন হলেই পেট খালি হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে অভ্যাস। বড় মামার চোখ রাঙানি এড়িয়ে ঝালমুড়ি নেই দশ রুপির। ঝালমুড়িটা ভালো করে। অনেক পেয়াজ আর নারকেল দিয়ে বানায়। মুড়ির সাথে মাখানো ঝোলের টেস্টটাই অন্য রকম। মুড়ি খেতে খেতে যখন মুখের ভেতর ছোট ছোট সেদ্ধ, মিষ্টি আলুর টুকরা পড়ে তখন আরামে চোখ বুজে আসে।
ঝাল মুড়ি মুখে দিয়েই আমি চোখ বন্ধ করে থাকি। অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করেনা। মায়ের অপারেশন নিয়ে টেনশন করতে ইচ্ছে করেনা। খাবার নিয়ে ভেবে অন্য সব কিছু ভুলে যেতে চাই।
'তোর মা মনে হয় আর পারলো না থাকতে।' কথাটা বলেই বাবা ফুঁপিয়ে কাঁদে।
আমি বাবার কান্না দেখি। এই লোক সচরাচর কাঁদেনা। বয়স্ক একটা মানুষের কান্না দেখতে ভালো লাগেনা।

‘দুলাভাই কাঁদবেন না তো। দোআ করেন। কাজে লাগবে।’ শুকনো গলায় বলে মামা। মন তারও ভালো নেই। আমুদে লোকটা শোকে ভয়ে ফাঁপা বেলুনের মতন চুপসে আছে।
ডাক্তার বলেছেন বিষয়টা আর তাদের হাতে নেই। সাধ্যমতন চেষ্টা করবেন বাকিটা ভাগ্যের ওপর।
অপারেশন হবে একটু পর। বারো ঘন্টার মেজর অপারেশন।
আমার ছোট বোন রুবির জন্মের পর থেকেই মা অসুস্থ। অলুক্ষনে রুবি। কষ্টের শেষ নেই মায়ের । মুখ থেকে দমক দমক রক্ত বের হয়। জ্বর-কাঁশি প্রতিদিনের গল্প। রোগ ধরা পড়েনা।
দেশের ডাক্তার বাঁদ যায়নি কোন। দেশে কেউ বলে টিবি আবার কেউ বলে ব্রঙ্কাইটিস। পীর, ফকির সবার কাছে ছোটা হয়েছে। উপকার নেই কোন।
অবস্থা যখন খুব খারাপ তখন আসতে হল ভারতে। কোন নোটিশ ছাড়াই হুট করে। হাসপাতালে ভর্তির পরপরই ডাক্তার বিশ্বজিৎ জানালেন অবস্থা ভালো না। অপারেশন লাগবে। শেষ চেষ্টা। ঠিক হবার চান্স কম।
অপারেশনের জন্য রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাবা রাজি হলেন। পরিবারের সবাইকে রাজি হতে হল।
শুধু মা বললেন, ‘আমি অপারেশন করবো না। আমাকে তোরা মারিস না। দেশে নিয়ে যা। আমি সুস্থ হয়ে যাবো দেখিস।’
অসুস্থ কারো কথা আমলে নিতে নেই। আমরাও নেইনি।
অপারেশন হবে কিছুক্ষন পরেই। মনমরা সবাই। মনে হয় আমার মায়ের আজ শেষ দিন। এই কোলকাতা শহরে মারা যাবে আমার মা। ভালো লাগেনা। এসব ছাইপাশ, কষ্ট নিয়ে পড়ে থাকতে ভালো লাগেনা।
অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে চাই। এই মাটির পৃথিবীতে দুনিয়ার সব কষ্ট একা নিতে চাই না।
রাগে দুঃখে গোগ্রাসে ঝালমুড়ি গিলতে থাকি। পুরো কোলকাতা গিলে ফেলতে ইচ্ছা করে। আই হেইট কোলকাতা।
এই মুহূর্তে দেশের কথা ভাবতে চাই। প্রিয় দেশের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ভালোবাসার বাড়িটার কথা।
বরিশালে আমাদের ছোট্ট একটা বাড়ি আছে। মধ্যবিত্তের মাথা গোজার ঠাই। বাড়ির খয়েরি গেটটা সবসময় শরীরে কাগজি ফুল আর লতা-পাতা পেঁচিয়ে পেটফোলা অজগরের মতন ঝিমায়।
বাড়ির নাম ‘আপন ভিলা’। চুপচাপ, শুনশাণ। গোরস্থান রোড থেকে বের হয়ে কাঁচা ইটের রাস্তা ধরে ত্রিশ-পয়ত্রিশ গজ হেঁটে আসলেই সবার আগে খয়েরি গেটটা চোখে পড়বে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি।
ঝা চকচকে উঠোন দেখে তাজ্জব বনে যেতে হয়। পরিস্কার রাখার জোর চেষ্টা!
আমার মায়ের শুচিবায়ু আছে। অপরিস্কার কোন কিছু সে সহ্য করতে পারেনা। সবকিছু ঝকঝকে তকতকে থাকা চাই। মায়ের কারনে আমরা ভাই-বোন আর বাবাও নোংরা কোন কিছু পছন্দ করিনা।
করার উপায় নেই। কারণ মাকে ভয় পাই। খুব বেশি ভালোবাসি বলেই হয়ত এই ভয় পাওয়া!
মা বলেছিল টাকা পয়সা একটু জমলে ঈদের পরেই পুরো উঠোনটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাবে বাবা। ভেতরে বসার জন্য ছোট ছোট টুলও থাকবে। তখন দেখতে জমাটি হবে। কিন্তু সেটি হবার জো নেই আর। মায়ের চিকিৎসায় বেরিয়ে যাচ্ছে টাকা। ধার দেনা হয়েছে অনেক।
টাকা পয়সার কথা বাদ দিয়ে বাড়ির কথায় আসি। ভেতরটা একদম সাজানো গোছানো। ফিটফাট। গেটে ঢোকার ঠিক পরপরই নিয়ম মেনে সৌন্দর্য বাড়াতে দাড়িয়ে গেছে সুপারি, নারকেল, মেহগনি আর গোলাপ, জবা ফুল। রজনীগন্ধা আছে একটা।
পাম ট্রি গাছের গা ঘেষে কতকগুলো পাতাবাহার ও আছে। কিছু চড়াই, শালিক, কাক এ বাড়ির দিকেই থাকে। একটা মন খারাপ করা শান্ত পুকুর, পাড় ঘেষে দাড়ানো গাছগুলোর ছায়া বুকে নিয়ে বিষন্ন গান গেয়ে যায় দিনভর। শ্যাওলায় ভর্তি সিমেন্টর ঘাট। পেট মোটা বিড়াল টুটু প্রতিদিন দুপুরে চুরি করে দুধ খেয়ে পালিয়ে যায় পুকুর পাড়ের পথ ধরে। ভারি লাগে দেখতে তখন বিড়ালের পাগলামি। এ বাড়ির সব সুন্দর। শান্ত সুন্দর!
আমার কলেজ কাছেই। ঘর থেকে বের হলেই ফনিক্স সাইকেলটা সাথে নেই। নগদ তিন হাজার টাকা দিয়ে কেনা সাইকেল।
সাইকেলের সামনে একটা অটো লাইট লাগানো আছে। রাতে চলাফেলার জন্য লাগে। মাসে একবার ব্যাটারি বদলালেই হয়। একটা মস্ত তালা আছে। সেটা চাকার সাথে পেঁচিয়ে লাগানো। এদিকে চুরির ভয় আছে। তাই সাবধান! বাইক চালানোর ইচ্ছা থাকলেও বাবা দেয়না। কলেজ এবং টিউশানির জন্য সাইকেলটাই ভরসা।
দেশে প্রতিদিন বিকেলে নিয়ম মেনে বের হই। মন ভালো করা বিকেলে, আকাশের নীল রং এর অতিরিক্ত ঝাপাঝাপি করা বিকেলে যেতে হয় মাহবুবার জন্য। মাহবুবা আমার স্টুডেন্ট। ভালো নাম তানঝি।
প্রাইভেট টিউশানিতে হাত খরচ টা উঠে আসে। বাবা হাতখরচ নিয়ে যন্ত্রনা দেয়। তাই অবসরে মাহবুবাকে পড়িয়ে দুটো আয় করছি। স্টুডেন্ট এর বাড়িতে গেলেই প্রতিদিন বাড়ির কাজের লোক ক্ষিতিশ সন্দেশ, মুড়ি আর দুধ চা নিয়ে আসে। খাওয়া শেষ হলে পরেই পড়ানো শুরু। আমি খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। অনেক সময় নিয়ে খাই। ভালো লাগে।

খাওয়ার লোভে মাহবুবার বাসায় যাওয়ার দিনগুলো মিস করিনা। সে আমার কাছে ছবি আঁকা শেখে। মাহবুবা সামনে ইন্টার দেবে। ক্লাসে ছবি আঁকার ঝামেলা নেই। ছোটবেলায় ছিলো। মাহবুবা তবুও ছবি আঁকতে চায়। শিখতে চায়। নিজের বাবার কাছে ছোট্ট আবদার তার এই।

বাবার এই ঢং পছন্দ না। সে বলে, 'ছবি আঁকা ধুয়ে কি পানি খাবো? ইন্টারটা দিলেই বিয়ে। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে পাহাড়া দেওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব না।' এই শহরে ইন্টারে পড়া মেয়ে মানেই বিয়ের বয়স হয়েছে। তাকে আর ঘরে রাখা যাবে না। রাখলেই সর্বনাশ। দেশের অবস্থা ভালো না। বখাটে ছেলেরা কখন না কি করে বসে! মান সন্মান রাখতে হবে তো নাকি!

মাহবুবার মায়ের কারণে ছবি আঁকানোর কাজটা আমি পেয়েছি। আমি আর্ট কলেজের স্টুডেন্ট নই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফিজিক্স নিয়ে পড়ছি। সায়েন্সের স্টুডেন্ট। মেট্রিকে বায়োলজির জন্য ব্যাঙ, মানুষের হাড় এসব আঁকতে হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই আঁকার হাত ভালো। নিজের চেষ্টায় ছবি আঁকা নিয়ে দু-একটা বাইরের বইও পড়েছি। এসব যোগ্যতার কারনেই পড়ানোর সুযোগটা হয়েছে।

মাঝে মাঝে ছবি আঁকার পাশাপাশি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এসবও পড়াতে হয়। মাহবুবার মা মেয়েকে নিয়ে লড়াই করেন মেয়ের বাবার সাথে। তিনি চান মেয়ে মানুষ হোক। পড়াশোনা করে ছেলেদের সাথে সমান তালে পাল্লা দিক।

মাহবুবার সবকিছুতে তার খবরদারি চলে। খবরদারি চলে আমার ওপরেও। আমাকে বলেছেন, 'খালি আঁকাঝোকা করলে হবেনা স্যার। এই বেতনে অন্যরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ সব পড়ায়। পড়াবেন স্যার। মাঝে মাঝে পড়াবেন। মেয়েদের এখন আর পড়াশোনা ছাড়া গতি নাই। কি বলেন?'

কথা মেনে নিয়েছি। যার হাত দিয়ে বেতন আসে তার সব কথা শুনতে হয়। প্রায় প্রতিদিন অল্প কিছুক্ষন ড্রইং করেই ফিজিক্সের বই নিয়ে বসি। টর্ক, চক্র এইসব জিনিষ পড়াই।

পড়াতে পড়াতে মাহবুবার সাথে আলাপ হয়। তার অনেক কিছুর সাথেই পাঠ্যপুস্তকের যোগাযোগ নেই। লুকাবো না, যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, মাহবুবার সাথে গল্প করতে আমার ভালোই লাগে।

কোলকাতা আসার আগে শেষবারের মতন গিয়েছিলাম ওর বাসায়। বিকেলে। তখন আকাশ লাল হয়ে ছিলো। ডিমের কুসুম যেভাবে ছড়িয়ে যায় ঠিক সেভাবে সূর্যের আলোর লাল রং ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে।

ফনিক্স সাইকেলটায় তালা দিয়ে মাহবুবার ঘরে ঢুকতেই কাজের লোক ক্ষিতীশ এক গ্লাস পানি দিয়ে যায়। ছেড়ে দিয়ে যায় টেবিল ফ্যানটা। শার্টের ওপরের বোতামটা খুলে আমি একটু শান্তি করে ফ্যানের বাতাস খাই। ভালো লাগছিলো।

মাহবুবা আসে। টেবিলে বসে। অনেক হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে। সামনে পরীক্ষা। পড়ার চাপ আছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। জানালা লাগোয়া নিম গাছ। পাতা এসে ঢুকে পড়েছিল গ্রিল দিয়ে। পাতার অদ্ভূত ক্ষমতা। ছোঁয়া লাগলেই সতেজ লাগে।

মন ভালো ছিলো খুব। কারণ বেতন হবে। কড়কড়ে নোট আসবে হাতে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ঘ্রাণ টাকার। ফুল, পাতা, সুগন্ধী সব হার মেনে যায় টাকার কাছে। ঠিক করেছিলাম টাকা পেলেই চলে যাবো রয়েল হোটেলে। মোগলাই আর দুধ চা মেরে দেবো। মায়ের জন্য শাড়ি কিনবো। নিজের জন্য কিছু কেনাকাটাও দরকার। বেতন না হলে বিপদ!

মানিব্যাগ এ সব নিয়ে দেড়-দুইশ টাকা আছে। বাকিটা ভর্তি ভিজিটিং কার্ড এ। ফোলা মানিব্যাগ দেখে অনেকেই ঘাবড়ে যায়। মনে করে অনেক টাকা কাছে। মানুষের এই চমকে যাওয়াটা ভালো লাগে। তাই মিছেমিছি কার্ড ভরে মানিব্যাগ মোটা করি।

শেষ পর্যন্ত বেতন হয়নি। টাকা ছাড়াই বের হয়েছি বাইরে।

একদিন আমার অনেক টাকা হবে। আমি এই স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখতে দোষ নেই।

তবে হ্যা আমার কোন স্বপ্নই আমার নিজের জন্য না। মায়ের জন্য।

খুব বেশিক্ষন ছিলাম না টিউশানিতে। ফেরায় সময় মাহবুবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসিনি। মেজাজ খারাপ ছিলো। মেয়েটার হাসি শোনা হয়নি। মেয়েটা সারাক্ষন হাসে। কারনে অকারনে হাসে। হাসিটা অদ্ভূত। শুনলে মনে হয় কাঁচ ভাঙছে।

মাহবুবাকে পড়িয়ে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়েছিলাম বন্ধুদের সাথে। শহরটা ছোট। সাইকেল নিয়ে টান দিলেই হয়। যেখানেই যাই না কেন পাঁচ থেকে দশ মিনিটের পথ। ব্যাডমিন্টন খেলে আবার বিবির পুকুরের পাড়ে আড্ডা। আলুর চপ, একটু লবন আর শসা।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটু রাতই। তখনও বুঝিনি মা ভালো নেই। একবারও মনে হয়নি। বুকের ভেতরটায় ভয় লাগেনি।

বাড়ি ফিরেই দেখলাম সাদা রং এর একটা এম্বুলেন্সটা দাড়িয়ে বাড়ির সামনে। প্রায়দিনই থাকে। আগে চমকাতাম। এখন আর চমকাই না। দশ-বারো বছর ধরে যার মা অসুস্থ তাকে এত চমকালে হয়না। ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকেই দেখি স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে মাকে। জ্ঞান নেই। মুখের কোনা থেকে গড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনা।

আর মনে নেই। মনে থাকলেও এখন গুছিয়ে লিখতে পারবো না। সময় লাগবে একটু।

আপাতত থাক। মাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হবে। চাইলেও পারছিনা ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দিতে। মন ভার হচ্ছে। মা যে আমার খুব প্রিয়।

‘মা, মাগো।’ খুব কাঁদতে ইচ্ছা করে। পানি কেনার কথা বলে বাবা আর মামার কাছ থেকে আড়াল হই।
কোঠারি হাসপাতালের ওয়াশরুমে ঢুকলাম। মুখে পানি দিলাম। দেখি হালকা হতে পারিনা।
জানি শোকের বয়স অল্প হয়। মানুষ ভুলে যেতে পছন্দ করে। মাকেও হয়তো ভুলে যাবো। একদিন-দুইদিন তারপর ছবি হয়ে থাকবে। মা ন্যাওটা ছেলে আমি। মুখে না বলতে পারলেও মাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।
মা মারা যাবে। ডাক্তাররা আশা দিতে পারছেন না।
কোলকাতার আকাশে আজ কি একটু ঝড় হতে পারে না? ভয়ংকর ঝড়। ধুলোয় ঢেকে যাবে পুরো শহরটা। ঘরবন্দী হবে মানুষ। গাছ, গাছের পাতায় তোলপাড় হবে। ডাল ভেঙে পড়ে রাস্তা বন্ধ হবে। এলোমেলো হবে তুমুল হাওয়ায়। সব এলোমেলো।
তারপর ঝড় শেষে হবে নীরব বৃষ্টি। তখন আমি মাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে নেবো। সুস্থ হয়ে সে যাবে তার বাড়ি ‘আপন ভিলা’ তে। ভিজতে ভিজতে।
ওয়াশরুম থেকে বের হই। বাবা আর মামার কাছে যাই। তাদের হালকা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।
‘মায়ের কিছু হবেনা। টেনশন নাই। সব ঠিক থাকবে। উন্নত চিকিৎসা।’ এতটুকুন বলে বাবা-মামাকে হালকা করতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলি। বাচ্চাদের মতন।
বাবা জড়িয়ে ধরেন। তিনিও কাঁদেন। বলেন ‘বাঁচানো যাবেনা রে। যাবেনা।’
ঝড় শুরু হয়। কোলকাতায়। আজব কান্ড!
কিসের আলামত জানা নেই। আমি এখন কিচ্ছু জানিনা। জানতে চাইনা।
শুধু কাঁদতে চাই। কান্নার দরকার আছে।
মাহবুবা পাশে থাকলে ভালো হত এসময়।
কেন এমন মনে হল?
কেন? ছি!

২.

কু-ঝিক ঝিক, কাঁশফুল,
থাকল জমা আমার ভুল।

ট্রেন এ দূর্ঘটনা।
ক্যানিং যাচ্ছি। হালকা বৃষ্টি হয়েছে সকাল বেলা।
গতকালের ঝড়ের পর দমকা হাওয়া। ধূসর, কালো মেঘ ঢেকে রেখেছে আকাশ আর সূর্যকে। বৃষ্টি হবে হবে ভাব।
দূর্ঘটনা নিয়ে লোকজনের চোখে-মুখে ভয়। আমি এসব কেয়ার করছিনা।
শরীরটা খারাপ। গাড়িতে উঠলেই বমি হয়। অ্যাভোমিন গিলে লং জার্নিতে যাই সবসময়। আসার পথে খেয়াল ছিলোনা ওষুধ খেতে। এদিকে অ্যাভোমিন পাওয়া যায় কিনা কে জানে!

বমি করেছি। করার পর অবশ্য ফুরফুরে লাগছে। সিদ্ধ ডিম খাচ্ছি। এর আগে খাওয়া হয়েছে বড়ই এর ভর্তা। ট্রেনে এসব বিক্রি হয়। চলতি পথে খেতে মন্দ লাগেনা।
বোন রুবি চোখ-মুখ শক্ত করে আছে যন্ত্রনায়। বাতের ব্যাথা। অল্প বয়সে এই রোগ সে কোথা থেকে আমদানি করল কে জানে!
'ব্যাথা ভাইয়া। ব্যাথা। চকলেট খাবো।' রুবি কেঁদে কেঁদে আবদার করে আমার কাছে। ব্যাথার সাথে চকলেট এর কি সম্পর্ক বুঝলাম না। রুবির সব কথাই চকলেটে গিয়ে শেষ হয়!
'গাধী, চুপ থাক। এইখানে চকলেট নাই। মাইর খাবি।' মেজাজ খারাপ করে বলি। খাওয়ার সময় বিরক্ত করলে চড় বসাতে ইচ্ছা করে।
'ব্যাথা তো।' বলে কান্না শুরু করে রুবি।
'চুপ। চুপ। চুপ। ক্যানিং পৌছে ক্যান্ডি। এর আগে না।' বড় মামা টেনশনে আছেন। রুবিকে ধমক দিয়েই সামনে কি অবস্থা জানতে লোকজনের সাথে কথা বলা শুরু করে। ট্রেন লাইনের দূর্ঘটনা নিয়ে খবরাখবর নেবার চেষ্টা করে।
আমি রুবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখায় মন দেই। রুবি ঘ্যান ঘ্যান করে। আমি পাত্তা দেইনা। চোখ বন্ধ করার মতন কান বন্ধ রাখার উপায় থাকলে মন্দ হতোনা। তাহলে এখন আর রুবির আলাপ শুনতে হত না। কান বন্ধ রাখতাম।
জানালার বাইরে এখানে অন্য পৃথিবী এক! নদীর বেসামাল জল ঝাপটা মারে পাড়ে। নৌকা কতগুলো ছুটছে। মহিষের দল সার বেধে পাড় হচ্ছে নদী। বৃষ্টির পর ধোয়া গাছের পাতা বড় বেশি সবুজ। এই সবুজ আর গ্রামটাকে একটু একটু করে গিলে ফেলার চেষ্টা করছে শহর। সবুজের শহরে উঁকি দিচ্ছে একটা-আধটা ইট-সিমেন্টের বাড়ি। বাড়ি উঠছে। ইট-বালু-সুড়কি স্তুপ করে রাখা। একটা ইটের ভাটাও চোখে পড়ল।
কচুরীপানায় ভর্তি একটা পুকুর আছে। প্যাকোর প্যাকোর করে কয়েকটা হাস নেমে পড়ল পুকুরে। সাতার কাটবে আরামে। গাছ, পাতা কেমন ধেয়ে আসছে নিজের দিকে। কু-ঝিক ঝিক, কু-ঝিক ঝিক, কু-ঝিক ঝিকে ঘুম চলে আসে আমার।
আজকাল সুন্দর কিছু দেখলেই আমার ইচ্ছে হয় মাকে দেখাতে। মায়ের তো আর অল্প কিছুদিন থাকা হবে পৃথিবীতে। সুন্দর কিছু দেখুক। ভালো করে দেখুক।
সুন্দর কোন কিছুর দিকে একটানা তাকালে আমার ঝাপসা হয় চোখ। মাকে ধরে রাখতে ইচ্ছে হয়। ধরে রাখার ব্যাপারটা নিজের হাতে নেই। কি অসহায় আমরা। কি অসহায় মানুষ!
'সন্মানিত যাত্রীগণ, ভালো কাজে, পূণ্য কাজে শরীক হন আপনিও। মন্দির হবে। চাঁদা প্রয়োজন। এখন দান করেন। পরে স্বর্গ নিশ্চিত করুন।' ট্রেনের ভেতর গেরুয়া পোশাক পড়া এক সাধুকে বলতে শুনলাম। এসব লোক সব জায়গায় আছে। পরিবেশের সাথে মানিয়ে যায়। মন্দ লাগেনা। দান-খয়রাতে তাদের জীবন চলে। আয় নেহাত মন্দ বলে মনে হয় না।
পাশের যাত্রী থেকে জানলাম মন্দিরের জন্য নিয়মিত টাকা ওঠায় এই লোক। কোথায় মন্দির জানা নেই। তিনি নিয়মিত যাত্রা করেন এই রুটে। সবসময় এই লোকের সাথে দেখা হয়। মন্দিরের কাজ কদ্দূর এটা নাকি জানতে চেয়েছিল একবার।
'সামনের অমাবস্যায়। দুটো ডাল-রুটি খেয়ে যাবেন সেদিন। আসবেন মশায়।' এই উত্তর ছিলো সাধুর। পাশের যাত্রীর কাছ থেকে এসব শুনেও লোকটাকে দশ রুপির একটা নোট দিলাম। নোটটা দিলাম দেখে পাশের যাত্রী মনে হয় মনোক্ষুন্ন হল।
চুপ হয়ে গেল সে। একটা কথাও বললো না আর।
সাধু লোকটাকে আমার ভালো লেগেছে। কোন এক গল্পের চরিত্র মনে হচ্ছে। তাই দান করেছি। দশ রুপি পাবার পর তার মুখের কোনায় ফুটে ওঠা হাসিটা দেখাই দরকার ছিলো। সে হাসিটা দেখলাম। মন ভালো হয়ে গেল। কে কি ভাবল, মন খারাপ করল কিনা এতে কিছু যায় আসেনা আমার তাই।
রুবির বাতের ব্যাথা কমে গেছে। আচমকাই। এখন সে হা হয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। সুন্দর দৃশ্য।
রুবিকে চকলেট কিনে দেওয়া হয়েছিল সকালে। বাদাম চকলেট। মুখে দিলেই বাদামের ঘ্রাণ।
সে চকলেট আরাম করে খেতে পারেনি রুবি। দুটো চকলেটের একটা আসার পথে তাড়াহুড়োয় ফেলেছে কোথাও। আর একটা কথা বলতে বলতে মুখে দেবার সময় হুট করে গলা দিয়ে নেমে গেছে। কোৎ করে গিলে ফেলতে হয়েছে তখন। আরাম করে খেতে পারেনি। এই শোক তাকে কাবু করেছে। তাই থেকে থেকে চকলেটের কথা মনে করে চিৎকার করেছে অনেকক্ষন।
আপাতত সব শোক, যন্ত্রনা ভুলেছে মেয়েটা এটাই শান্তি। রুবির মুখ নিয়ে আমরা শংকিত। সে চুপ থাকলেই বাঁচোয়া।
ক্যানিং এ যাচ্ছি অপুদার সাথে দেখা করতে। অপূর্ব সরকার। বরিশালে আমাদের পাড়াতেই থাকে। একসাথে ক্রিকেট খেলতাম। পড়তে এসেছে এই ছেলে ভারতে। ক্যানিং এ থাকে। এখানেরই কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে মনে হয়।
ভারতে পড়তে আসলেই আমরা তাকে মেধাবী ছাত্র মনে করি। দেশে থাকতে অপুদার পাশ করতেই ঝামেলা হয়ে যেত। এখানে এসে নাকি ভালো ছাত্র হয়ে গেছে। রেজাল্ট ভালো। বাবার কাছে শুনেছি।

বাবা বলেন, 'পা ধোয়া পানি খাও। দেখো কি জেদ ছেলের। এক সময় ছাত্র খারাপ ছিলো আর এখন? হবেনা। তোমাকে দিয়ে হবেনা।'
আমাকে নিয়ে বাবার অভিযোগের কমতি নেই। তিনি নামকরা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। আমার সে সুযোগ হয়নি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এসব কিছুই হতে পারিনি। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন ছিলো অনেক। সে স্বপ্নে ছাই ঢেলে দিয়েছি।
আগে এসব নিয়ে কথা উঠলে আমার গা জ্বলত। বাবার কথার পিঠে আমিও কথা বলতাম। এখন চুপ করে থাকি। চুপ করে থাকাই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান।
ট্রেন লাইন তুলে ফেলেছে কারা যেন। গুজব ছড়িয়েছে ট্রেন এ দূর্ঘটনা!
এদিকটায় রাজনৈতিক কোন ঝামেলা চলছে। ভয় করছিল লোকজন এটা নিয়েই। শোনা যাচ্ছিল ট্রেন থামিয়ে লুটপাটও হয়েছে। ঘটনা এতটা সিরিয়াস না। তবে ঝামেলা কিছু হয়েছে। রাজনীতির সুযোগ নিয়ে উটকো লোকজন এটা ওটা সামান্য জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছে।
ক্যানিং পৌছাতে দেরি হয়না। মফস্বল শহর। অল্প কিছু বাড়ি আর অল্প কিছু মানুষ।
বাবা একটা ঝামেলায় পড়েছেন। বিস্তারিত জানিনা। বাবা আর মামা আলোচনা করেন। আমাকে গোনায় ধরেনা। যতটুকু জানি তাতে বুঝলাম পুলিশি ঝামেলা। ডলার এনডোর্স করাতে গিয়ে কোন একটা সমস্যা। ভিসা আর পাসপোর্ট নিয়েও কিছু হয়েছে মনে হয়।
অপুদার পরিচিত একজন উকিল আছে এখানে। সরূপ মুখার্জি। জাদরেল উকিল।
মুশকিল আসানের জন্য তিনিই একমাত্র ভরসা। অপুদার সাথে বাবার আলাপ হয়েছে আগে। সরূপ মুখার্জি ক্যানিং থাকেন। তার বাড়িতে আজ নিয়ে যাওয়া হবে আমাদের। সেখানে ঝামেলা নিয়ে কথাবার্তা হবে। উকিল সাহেবের সন্মানী কেমন হবে সেটা নিয়েও কথা হবে।
স্টেশন থেকে অপুদার বাড়ি কাছেই। ঠিকানা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়না।
এদিকে এখনও বাড়িঘর ওঠেনি তেমন। বেশিরই ভাগই খোলা জমি। কোনটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের পাশ দিয়ে দাড় করানো ছোট টিনের বোর্ড। এসব বোর্ডে লেখা 'এই জমির মালিক 'ক,খ' গ' ইত্যাদি। একদম আমাদের দেশের মতন!
অপুদার বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কয়েকটা ছেলে 'কুটুম গো কুটুম।' বলে চিৎকার শুরু করে। অবাক হই।
অবাকপনা কাটিয়ে দোতলা একটা বাড়ির নিচতলায় গিয়ে দরজায় নক করি।
নিচতলায় দুটো ঘর নিয়ে থাকে অপু দা। গিয়ে দেখলাম মাত্র ঘুম ভেঙেছে তার। দরজা খুলে আমাদের বাইরে দাড় করিয়ে রাখল। তারপর অনেকক্ষন পর বাবা আর মামাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে এসে আমার সাথে কথা শুরু করল।
'আছস ক্যামন তোরা?' জড়ানো কথা। অপুদাকে দেখে মনে হল কোন একটা সমস্যা হয়েছে। মাথা ঠিক নেই।
'ভালো। পড়াশোনা করছি।' বাবা বলেছে পড়ুয়া ছেলে অপুদা। তাই পড়াশোনার ব্যাপারটা কথার শুরুতে জোর করেই বললাম।
'ধুর। পড়া ফড়া দিয়া কি করবি। এই সবে দম নাই। ছাড়ান দে।' কথাটা বলে অপুদা আমাদের ভেতরে ডাকে।
বাবার চোখে অবাকপনা। মামারও একই অবস্থা। রুবিকে দেখে মনে হল সে খুব মজা পাচ্ছে।
আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছিনা। বোকার মতন সবাই ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। দেখি ঘরের এককোনায় তোশক বিছানো। সিগারেটের ধোয়ায় বন্দী ঘর। বমি আসে। চোখে পড়ল এক কোনায় মদের বোতল। বাবার ভালো ছেলে, পড়ুয়া ছেলের অবস্থা দেখে আকাশ থেকে পড়লাম। দেশের বাইরে এসে এই অবস্থা!
বাবা মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কত ভালো কথাই না আমাকে শুনিয়ে ঝাড়ি দিয়েছে। এখন এখান থেকে বের হয়ে লজ্জায় মুখ দেখানোই কষ্ট হয়ে যাবে।
আমি খুশি। বাবার শিক্ষা হল। খুশিতে আটখানা হয়। আমি বারো-ষোলখানা হয়ে আছি।
'ঘরের অবস্থা ভালো না আঙ্কেল। তোশক ধোয়া না। তোশকে বমি আছে। বমি করছিলাম। শুকায় গেছে। মেঝেতে বসেন। ঘর মোছা আছে। একটু এডজাস্ট করেন।' বলে অপুদা।
'না না। ঠিক আছে।' বলে বাবা। তার অবস্থা সঙ্গীন।
অপুদা বাথরুমে ঢোকে। আমরা বসে থাকি। শুনি, বাথরুমের ভেতর থেকে তার বেসুরো গলার হিন্দী গান। গোসল করছে মনে হয়। অতিথিদের বসিয়ে রেখে এসব কি? আজব!
'বাবা, এইগুলা কি মদ?' তোশকের পাশে থাকা মদের ভেতর দেখিয়ে বাবাকে বলে রুবি। ধোয়া তার সহ্য হচ্ছেনা। কাঁশি দিচ্ছে একটু পর পর।
'চুপ। শাট আপ।' রুবির কথার জবাব না দিয়ে বাবা ধমক দেয়।
'এইগুলা মদ।' খুশিতে গদগদ হয়ে রুবির কথার জবাব দেই আমি।
কথা শুনে বাবা রক্তচক্ষু নিয়ে তাকায়। গ্রাহ্য করিনা। বোঝা যাচ্ছে আজ আমার দিন।
'বাবা, মদ খাবো।' রুবি আবদার শুরু করে। অদ্ভূত আবদার।

রুবি এই কথা বলতেই বাবা ঠাস করে একটা চড় মারে রুবির গালে। রুবি কান্না শুরু করে। আমার সাথে রুবির শত্রুতা, ঝগড়া। ছোট বোন মানেই যন্ত্রনা। রুবির চড় খাওয়া দেখে খুশি হই।
রুবি কাঁদতে কাঁদতে বলে 'মদ খাবো। মদ খাবো।' তারপর আচমকা বলে, 'মদ না কিনে দিলে আমিও কিন্তু মায়ের মতন মরে যাবো।' কথা শুনে চুপ হয়ে যেতে হয়। এসব কই থেকে শিখল রুবি?
মায়ের অপারেশনটা পিছিয়েছে। আগের দিন শরীর এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে অপারেশন করার দিনটি উপযুক্ত নয় বলেই মনে করেছেন ডাক্তার। মাকে হাসপাতালে একা রেখে আমরা ক্যানিং এসেছি। বিপদ যখন আসে সবদিক থেকেই আসে। ডলার এনডোর্স নিয়ে ঝামেলাটা না হলেও তো হত। করুনাময় কোন এক কারণে হয়ত আমাদের ওপর সন্তুষ্ট নন। তাইতো এত বিপদ। এত কষ্ট।
'রুবি, মায়ের মতন মরে যাবো মানে কি? মা আর মেয়ে দুজনকেই বাঁচতে হবে। বুঝলা? আর মদ খেতে হবেনা। মদ খারাপ। চলো তোমাকে চকলেট কিনে দেই। ফাটাফাটি চকলেট।' অপুদা বাথরুম থেকে বের হয়ে বলে রুবিকে। কখন বের হয়েছে খেয়ালই করিনি আমরা কেউ।
রুবিকে নিয়ে অপুদা মোড়ের দোকানে যায়। কেউ না করিনা। চকলেট পেলে রুবির কান্না থামবে হয়ত।
মাথার ভেতর ঘুরছে রুবির কথাটা। 'আমিও কিন্তু মায়ের মতন মরে যাবো।' কি বাজে কথা।
অপুদা এসে বাঁচিয়ে দিল। রুবিকে থামিয়ে দিয়ে এই আহত মুহূর্তটার শরীরে একটু হলেও ভালো থাকার প্রলেপ লাগাল।
যেই অপুদার ওপর বিরক্ত হচ্ছিলাম একটু আগেও, ধোয়া ভরা এই ঘরটার ভেতর বসে সেই অপুদার ওপরেই কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে আমাদের তিনজনের মন। বাবা, আমি আর বড় মামা।
কেন জানি আমার মনে হয় অপুদা আমাদের কোলকাতা থেকে দেশে যাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিতে পারবে সহজেই। মামা বলেছেন, আমরা দেশে যেতে পারবো না। ডলার এনডোর্স নিয়ে ঝামেলাটা এত গভীর যে জেলে যাওয়া হতে পারে। না জেনে, না বুঝেই কঠিন অপরাধ করা হয়েছে। মামা বাড়িয়ে বলেন। অত আমলে নেইনি। তবে কিছু কিছু তো সত্যি। সেটা অপুদা ঠিক করে দেবে। আমাদের অপুদা ঠিক করে দেবে। এধরনের মানুষেরা অনেক কিছু পারে। অনেক কিছু।
কোলকাতায় থাকা দিনগুলোর ভেতর আজকের দিনটা অপুদার কারনে আমার মনে থাকবেই। ভোলার উপায় নেই।
'পৃথিবীতে ভালো মানুষ আছে রে। ভালো মানুষ আছে।' অপুদা বের হয়ে যাবার কিছুক্ষন পর বাবা আস্তে করে বলে।
আমি আর মামা মাথা ওপর নিচ করে তার কথা মেনে নেই।
মেনে নিতেই হয়!
অপুদা ভালো থাকুক। আমাদের ভালোয় ভালোয় মাকে নিয়ে দেশে যাবার ব্যবস্থা করে দিক।
পাগলামি করলেও ওপরওয়ালা তাকে ভালো রাখুক। রাখুক।
প্রার্থনা এই তো ।

৩.

আপন নেই, শুধুই পর,

ঘুমায় দেখো অজগর।

আস্ত মানুষটাকে গিলে ফেলেছে সাপটা।
রুবি ভয় পায়। বড় বড় হয়ে যায় তার চোখ।
গাইড এটাই চাচ্ছিল। ওলট পালট, বানোয়াট গল্প বলে পর্যটকদের ধরে রাখার চেষ্টা। রুবি তার কথায় ভুললেও আমরা ভুলিনি।
ছয় রুপি করে টিকেট। রুবির জোরাজুরিতে আমরা চারজনই এসেছি আজ চিড়িয়াখানায়।
দিনটা ভালো। রবিবার। ছুটির দিন।
রুবি ছোট বলে মায়ের সাথে দেখা করা নিষেধ। শুধু ছুটির দিনে শিশুরা রোগীর সাথে দেখা করতে পারে। ফূর্তিতে আছে রুবি। একটু পরপরই খুশিতে বলছে, 'মাকে দেখবো। কি মজা। কি মজা।'
আমরা সবাই আসলে মাকে খুব মিস করি। কিন্তু আচার আচরনে সেটা বোঝাই না। নিজেরা স্বাভাবিক থেকে অন্যদের স্বাভাবিক রাখার বৃথা চেষ্টা করি।
মায়ের সাথে দেখা হবে বিকেলে। তার আগে চলবে ঘোরাঘুরি। বাবার কাছে এই আবদার রুবির। চিড়িয়াখানায় বাঘ, বানর দেখা শেষ করে যাওয়া হবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। পার্ক স্ট্রিটের একটা দামী রেস্টুরেন্টে হবে খাওয়া দাওয়া।
খোশমেজাজে আছে বাবা ছাড়া সবাই। চিড়িয়াখানায় ঢুকেই ফ্রুট স্যান্ডউইচ আর কোক খেয়ে নিয়েছিলাম আমরা। এত বড় চিড়িয়াখানাটা চক্কর দিতে দিতে খিদে পেয়েছে আবার।
মায়ের শরীর ভালো তাই সবার মুখে হাসি। মনে হচ্ছে চিকিৎসার জন্য নয়, বরং কোলকাতায় বেড়াতে এসেছি আমরা।
বাবার মুখটা শুকনো। যতদুর জানি ডলার এনডোর্স এর ব্যাপারটা থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে। চিন্তায় বাবার মুখটা ছোট হয়ে গিয়েছে। মায়া লাগছে। নিজেকে অসহায় লাগছে। আমার কিছু করার নেই। কিছু করার থাকলে ভালো লাগত।
আফসোস, এই পৃথিবীতে আমার ক্ষমতা অতি সামান্য।
হাতের টাকা শেষ হয়ে আসছে। মায়ের পেছনে অনেক টাকা খরচ হয়। এই খরচ বাড়ছেই। দুই হাজার রুপির তিনটে ইনজেকশন দিতে হয় প্রতিদিন। বাবা সামাল দিতে পারছেনা। ধার দেনায় জর্জরিত একদম।
দেশে যাবেন। গ্রামের জমি বিক্রয় করা হবে। ওদিকে জমির দাম নেই। শতাংশ হাজার পচিশেক। এর আগেও তের কড়া বিক্রি করা হয়েছে। তের কড়ায় মনে হয় ছাব্বিশ কাঠা। আমি এসব বুঝিনা। হিসেব নিকেশে কাঁচা একদম।
আমার ভয় অন্য জায়গায়। বিক্রির তালিকায় 'আপন ভিলা'ও না এসে যোগ হয়। বুক কেঁপে ওঠে।
নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে দাড়ানো ধূসর ঘিয়ে রং এর বাড়িটা আমার সব কিছু। অতি যত্নে বাড়িটি পুরনো হবার জো নেই। দিনের পর দিন পার হলেও একদম চকাচক চারপাশটা। নতুনের মতন! ভালোবাসার বাড়ি।
ছিমছাম উঠোনে দাড়ানো প্রিয় ফনিক্স সাইকেল। সপ্তাহে তিন দিন ধোয়া হয়। যত্ন আত্তি ভরপুর। ব্রেক, হ্যান্ডেলে কোন সমস্যা নেই। ক্রিং ক্রিং করে মাহবুবার বাড়ি যাওয়া। সোনায় মোড়ানো দিন। দেশে যেতে চাই। খুব করে চাই। হাঁপিয়ে উঠেছি অল্প দিনেই।
'আকাশের সাথে থাকিস তোরা।' বলে বড় মামা।
নতুন এই পাবলিককে ভিনদেশে খুঁজে পেয়েছে সে। কোঠারি হাসপাতালের সামনে দাড়িয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে পরিচয়।
বড় মামার দিকে লাইটার এগিয়ে দিয়ে আকাশ মামা বলছিল,'ভাইজান, বাংলাদেশের বুঝি? বোঝা যায়না। যে সুদর্শন, সুঠাম শরীর আপনার! বাংলাদেশের মানুষ হয় প্যাতপ্যাইতা। শরীরে নাই পুষ্টি। হাইট টাইনাটুইনা চাইর থেকে পাঁচ ফুট।'
দেশের মানুষ নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলায় মামার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল।
নিজের প্রশংসা করা হয়েছে বলেই চুপচাপ হজম করে নিয়েছে ব্যাপারটা। দুই দিনের পরিচয়ে একদম দহরম মহরম অবস্থা।
আমাদের ডেকে বলল, 'অই শোন, আকাশ এখন থেকে তোদের মামা। আকাশ মামা। আমার চাইতেও তারে তোরা রিসপেক্ট বেশি দিবি। ঠিক হ্যায়?' মামার কথা শুনে আমরা মাথা নেড়েছি।
বড় মামা আজকাল একটু আধটু হিন্দী বলে। ভারতে আসার ফল।
কথার মাঝখানে মাঝখানে হিন্দী শব্দের ব্যবহার করে অযথাই। হ্যায়, ক্যায়া, কুছ, তুম, হাম, কায়কো এইসব শব্দের ঠুসঠাস ব্যবহার চলে । কানে লাগে। মামা বোঝেনা। তিনি বলেই যান। সারাক্ষন।
আকাশ মামা লোকটা খারাপ না। শুনেছি কোটারি হাসপাতালে তার এক ফুফু ভর্তি আছেন। মুমূর্ষু অবস্থা। বাঁচবেন না।
আকাশ মামাকে দেখে মনে হয়না তিনি ফুফুকে নিয়ে চিন্তিত। ফুরফুরে মেজাজে থাকেন সবসময়। হাতে সোনার ব্রেসলেট। রঙিন শার্ট আর জিন্স। শরীরে সুগন্ধীর গন্ধ ভুরভুরিয়ে আসে। ঘামের নোনতা গন্ধের সাথে সুগন্ধী মিলে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা হয়। আমাদের বমি চলে আসে। আমি আর রুবি অনেক কষ্টে সামাল দেই বমি করাটা।

আকাশ মামা বলেছেন, তার বাড়ি চট্টগ্রামে। সেখানকার ক্ষমতাবান এক রাজনীতিবিদের ভাতিজা তিনি। ডলার এনডোর্সের বিষয়টা তিনি মিটমাট করে দেবেন সহজেই। এগুলো তার কাছে ওয়ান টুর ব্যাপার। আকাশ মামার ফুফুকে আমরা দেখিনি। তিনিও নিয়ে যান না।

বাবা লোকটাকে পছন্দ করত না। বড় মামা আর আকাশ মামার অনুপস্থিতিতে আমাদের বলেছে,'সাবধানে থাকিস। তোর মামা তো একটা ছাগল। দুনিয়ার সবাইরে বিশ্বাস করে ধরা খায়। কোন চোর বাটপার ধরে নিয়ে আসছে এবার কে জানে!'

আমরা সাবধানে নেই। সাবধানে থাকার মতন কিছু নেই। হোটেল রুমে আছে অল্প কিছু জামা কাপড়। টাকা ফুরিয়ে এসেছে।

বাবা দেশে গিয়ে জমি বিক্রি করে টাকা পাঠালে আবার সাবধানে থাকব। এখন আকাশ মামাকে নিয়ে ভয় করছি না।

মা বাসমতি চালের ভাত আর মাগুর মাছ খেতে চেয়েছে। বড় মামা আর বাবা অনেক চেষ্টা করেও ম্যানেজ করতে পারেনি। আকাশ মামা করেছে। তারপর থেকে মুখে স্বীকার না করলেও বাবা আকাশ মামাকে একটু একটু পছন্দ করা শুরু করেছে। যে কোন কিছুর জন্য বড় মামাকে বাদ দিয়ে গোপনে আকাশ মামার সাথে শলাপরামর্শ করছে।

মামা বিষয়টা জানত না। রুবি বলে দেবার পর হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। তক্কে তক্কে আছে গোপন আলাপের সময়ে হাতেনাতে ধরবে বাবা আর আকাশ মামাকে। ধরার পর কঠিন ঝগড়া। বাবার সাথে। আকাশ মামাকে কিছু বলবেন না কারন তিনিও আকাশ মামাকে খুব পছন্দ করেন।

আকাশ মামাকে পছন্দ করেন মা'ও। মাগুর মাছ আর বাসমতি চালের জন্য না। মায়ের অপারেশনের সময় বি পজিটিভ রক্ত লাগবে। বড় মামার বি পজিটিভ। জন্ডিস বলে তিনি রক্ত দিতে পারবেন না। আকাশ মামা দেবেন। কাকতালীয়ভাবে আকাশ মামার বি পজিটিভ রক্ত কমন পড়েছে। রক্ত দেবার পর মা বলেছে, 'আকাশ, তুমি আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও আপন।' এভাবেই পছন্দের শুরু।

বড় মামা এসব নিয়ে যন্ত্রনায় আছে। তার নিজের বোন এই কথা বলতে পারে এটা সে বিশ্বাসই করতে পারেনা। রুবিকে বলেছে 'হাউ কাম। হাউ? বলতো রুবি, তোর মা বলছে আকাশ নাকি আমার চেয়েও আপন। দু-ফোটা রক্তের জন্য ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। ছি!'

রুবি মামার দুঃখ বুঝেছে। মামার দুঃখ ভোলানোর জন্য ঘুরে বেড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। চালাক রুবি, স্বার্থপর রুবি। মামার পকেটের টাকা খসিয়ে আরামসে ঘুরেছে সে।

হোটেলের সামনের রাস্তায় বসে খেয়েছে লেবুর শরবত, চাওমিন আর লাল রং এর শিক কাবাবের সাথে মোগলাই পরোটা। সবশেষে আমরা এখন যেখানে থাকি সেখানকার সামনেরই এক যুবক সংঘ ক্লাবে গিয়ে রুবি মামাকে শুনিয়েছে ব্যান্ড সংগীতের কিছু দুঃখের গান। প্রতিদিন বাজায় এখানে এলাকার ছেলেরা। যে গান গায় তার বেশির ভাগই দুঃখের। 'তোমাকে পাইনি, ভুল বুঝেছ, পৃথিবী নিষ্ঠুর,...।' এমন সব বিষয়ই উঠে আসে গানের কথায়।

মামার গান শুনে দুঃখ কমেনি। বরং বেড়েছে আরও। রুবি বলেছে মামা নাকি হোটেলে ফিরে দরজা আটকে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। আমরা কেউ ছিলাম না। রুবি দরজার বাইরে থেকে শুনেছে সব।

আমরা হোটেল ছেড়ে একটা ভাড়া বাসায় উঠেছি। আকাশ মামার বুদ্ধি।

এটাও এক ধরনের হোটেলই বলা যায়। খরচ কম। কোলকাতার কোন এক হোমরা চোমরার বাড়ি। তিনি এখানে থাকেন না। তার বড় ভাই যিনি কিনা জীবনে কিছুই করতে পারেননি তাকে এ বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ছোট ছোট রুম হোটেলের মতন ভাড়া দিচ্ছেন।

আকাশ মামার সাথে এই লোকের পরিচয় কিভাবে জানা নেই। লোকটার নাম হিমেল কান্তি। লোক ভালো। ভদ্র। তার স্ত্রী মারা গেছেন। ঘরে আছে দুই মেয়ে আর ভয়ংকর এক কুকুর। মেয়ে দুটোর নজর ভালো না। ওলটপালট দুষ্টামি করে। লজ্জার মধ্যে পড়ে যাই। এ নিয়ে কথা বাড়ানো ঠিক হবে না।

রুবি কমিকস্ বই এর খুব ভক্ত। চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিংকি সব তার টোটস্থ। এদিকে বইয়ের দাম কম। কোঠারি হাসপাতালের নিচতলাতেই দোকান আছে। হালকা খাবার, শো পিস থেকে শুরু করে বই সব পাওয়া যায়। বাবা প্রতিদিন রুবিকে একটা চকলেট বার আর বই কিনে দেন। রুবি শান্ত থাকে।

মেয়েটা পড়ুয়া আছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক নিয়ে তার রাজ্যির এলার্জি। যে পরিমাণ আউট বই পড়ে সেটা পাঠ্যপুস্তক হলে নির্ঘাত ক্লাসে ফার্স্ট বা সেকেন্ড হত। একই ক্লাসে দুই-তিন বছর ধরে থাকতে হত না।

পুরোটা দোষ অবশ্য রুবিকে দেয়াও যায়না। মায়ের অসুস্থতার কারণে আমরা কেউ ওর খোঁজ নিতে পারিনা। কি পড়ছে, কিছু লাগবে কিনা এসব জিজ্ঞেস করা হয়না। আমাদের অগোচরে মেয়েটা একা একাই বড় হয়ে উঠছে।

আকাশ মামা থাকলে জম্পেশ খানাপিনা হয়। আজও হয়েছে। নান রুটি, মাংস, গোলাপ জাম দিয়ে দুপুরের খাবার।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দেখা শেষ করে গাইডকে বিদায় করে যাওয়া হয় ফেন্সি মার্কেটে। মামা কেনাকাটা করেন। ঠান্ডা তেল, সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, কলমদানি এসব হাবিজাবি কেন কিনছেন বুঝিনা!

দুপুরের পিঠে সওয়ার হয় বিকেল। আমি, রুবি, বাবা, বড় মামা, আকাশ মামা মায়ের সাথে দেখা করতে যাই।
'মন ভালো তোর?' মায়ের কেবিনে ঢোকার আগে রুবিকে বলি। বাবা, বড় মামা, আকাশ মামা আগেই ঢুকেছেন। রুবির ঢোকার জন্য অনুমতি লাগবে। অনুমতি পেলে ঢোকা হবে। এর আগ পর্যন্ত রুবি আমার সাথে আছে।
'খুব ভালো। শপিং করছি। ঘুরছি।' রুবি হাসতে হাসতে বলে। সে যেন উড়ছে খুশিতে।
'পড়াশোনা না থাকলেই তো তোর মন ভালো থাকে।' কোলকাতা আসার জন্য রুবি ফাস্ট টার্ম পরীক্ষা দিচ্ছেনা। এই নিয়ে তার আনন্দ ধরেনা। পড়াশোনা নিয়ে কথা বলে আমি একটু বড় ভাই সুলভ আচরন করার চেষ্টা করি।
'সারাদিন পড়া পড়া করবা না তো।' রাগ করে বলে রুবি।
' আচ্ছা করবো না। মায়ের সাথে দেখা করবি আজকে। খুশি?'
'খুশি আবার খুশি না।' মুখ ভার করে বলে রুবি।
'কেন? মানে?' অবাক হই আমি।
এমন সময় ডাক পড়ে। আকাশ মামা অনুমতি এনেছে। মায়ের রুমে ঢুকি। মাকে চেনার উপায় নেই। শুকিয়েছে শরীর। চোখের নিচে কালি। হাতের রগগুলো কালো কালো হয়ে চোখে পড়ছে খুব বেশি। কিছু অচেনা, অজানা নল সূচ দিয়ে ঢোকানো শরীরে।
'তোরা বস এখানে।' মা আস্তে করে বলেন। কথা বলতেই তার কষ্ট হয়। মনে হয় অনেক পরিশ্রমের কাজ।
আমরা দুজন তার দু পাশে বসি। মা রুবি আর আমার কপালে চুমো খান। তারপর বড় মামাকে বলেন আমাদের খেয়াল রাখতে। বাবা চলে যাবে দেশে এটা মাথায় আছে মায়ের।
সবশেষে মা কাঁদেন। শুধুই কাঁদেন। কান্নায় কোন আওয়াজ নেই। চোখের দু-কোন হতে গড়িয়ে পড়া জল শুধু।
আমরা অনেক বোঝাই, বলি, 'মা, কাঁদবা না। কাঁদলে শরীর খারাপ করবে আরো।' মা শোনে না।
নার্স বিরক্ত হয়। একটু পরেই বলে, এভাবে থাকলে রোগী অসুস্থ হয়ে যাবে। বাইরে যান আপনারা।
মা আমাদের যেতে দিতে নারাজ। বাবা মাকে ধমক দিয়ে বলে, 'এইজন্যেই আনতে চাইনা ওদের। বাচ্চাগুলার মন খারাপ হয়না? রেস্ট নাও।'
আমি আর রুবি বের হই। বাবা, বড় মামা, আকাশ মামাকে কেবিনের ভেতরে রেখে হাসপাতালের করিডরে হাটাহাটি করি।
'ভাইয়া, মাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে আবার দেখলে খুশি হতে পারি না। এই জন্যেই পারিনা। মায়ের কান্নাকাটি ভালো লাগেনা।' এ কথা বলে আমার হাসের ছানার মতন ছোট বোনটা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।
আমি তাকে বুকে টেনে নেই।
আহারে ছোট বোনটা আমার। আহারে ছোট বোনটা।
কত কষ্ট তার! কত কষ্ট আমাদের।
আচ্ছা, মেয়েটা কি জানে সামনে আরো অনেক কষ্ট তার জন্য অপেক্ষা করে আছে?
না। জানেনা।

পথে পথে হলুদ রোদ,
যা দিয়েছ করবো শোধ।

মাটির পৃথিবীতে পরী দেখলাম প্রথবারের মতন।
আমার স্বপ্নে পরী আসে। তাবিজ এনে দিয়েছিল মা। আমি সুন্দর বলে নাকি পরীদের বদ নজর পড়েছে এমন ধারনা তার।
তাবিজ থাকলে কোহেকাফ নগরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব!
পরী ফরি না রোগটা হল বোবা ভূতে ধরা। এমন অনেকেই বলেছে।
এই রোগ নিরাময় যোগ্য না। তাই আমার ঘুম হয় যন্ত্রনার। অনেকটা ভয়ের।
পরীর মতন মেয়েটাকে দেখলাম। এত সুন্দর কিভাবে হয়?
'এই শহরের ছেলেরা হাবাহুবা। মেয়েগুলো সুন্দর কিন্তু নাকি?' আমার দিকে তাকিয়ে বলে আকাশ মামা।
'হুম। হু।' আমার মুখ থেকে আর কোন শব্দ বের হয়না। কিছু সুন্দরে থমকে যেতে হয়। ভাবতে হয়।
কালো ফতুয়ার মতন কিছু একটা পড়া মেয়েটা। কোমরে সামান্য মেদ। চুলে দুটো বেণি দুদিকে বেসামাল হয় বারবার। দুধসাদা গায়ের রং। ঠোটে লিপস্টিক নেই। এতটাই গোলাপী যে লিপস্টিক দেবার প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয়না। চোখে একটু কাজল। প্রসাধনী বলতে এতটুকুনই। জিন্স পড়ে আছে। হাতে লাল সুতোর মতন কিছু একটা। এর বেশি কিছু নেই। তবুও অনেক বেশি বেশি মনে হয়। বেশিই সুন্দর।
'কি হেল্প করতে পারি বলো?' বলে মেয়েটা।
'জ্বি, কিছু না।' থতমত খাই কথা বলতে গিয়ে। কি করতে এসেছি সেটাই ভুলে গিয়েছি। আর কোলকাতার লোকদের হুটহাট 'তুমি' বলাটা একদমই পছন্দ না। নার্ভাস করে দেয়।
'আপনার নাম ম্যাডাম?' বলে আকাশ মামা কানের পাশ থেকে। আমার বিরক্ত লাগে। কি দরকার কথা বলার। মেয়েটাই বলুক না। আহ্, কণ্ঠটাও সুন্দর। মাহবুবার কণ্ঠ এত সুন্দর না। কোন মেয়ে দেখলেই আমি মাহবুবার সাথে তুলনা করি। এটা ভালো না।
'আমার নাম বুনো। বলো কি লাগবে?' বলে মেয়েটা।
বুনো কেমন নাম? এমন নাম মেয়েদের হয়? কিন্তু সুন্দর। এই মেয়ের সবকিছু সুন্দর। তার নাম যদু মধু কদু হলেও আমার খারাপ লাগত না মনে হয়।
'একটা রিকোয়েস্ট করতে এসেছি। পেমেন্টটা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে কিন্তু রোগীর চিকিৎসা তো আটকে রাখা যায়না কি বলেন?' বুনোকে বলে আকাশ মামা। এই মেয়ে একাউন্টস এর দায়িত্বে আছে। এমন সুন্দর একটা মেয়ে রসকষহীন কাজ করছে। একাউন্টস বিষয়টাই আমার কাঠখোট্টা মনে হয়।
'ডিটেইলস বলো?' বলে বুনো। তার চোখে কি মায়া! তার চোখ দেখি। তিরতির করে কাঁপা চোখের পলক দেখি। কি সুন্দর নাক। স্কেল দিয়ে মেপে মেপে কাটা যেন। ইচ্ছে করে নিখোঁজ হই। এই মেয়ের সৌন্দর্যে হারাতে ইচ্ছে করে।
'আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। কিছু পেমেন্ট ক্লিয়ার করতে পারি নাই। টাকা দেশ থেকে পাঠাতে একটু দেরি হচ্ছে। দুই-চার দিন। এই সময়ে ট্রিটমেন্ট যাতে চালায় যায় এইটা একটু দেখতে হবে।' বলে আকাশ মামা। আমাকে খোঁচায়। আমি যাতে কিছু বলি এটা চায় সে।
'আমাদের রুলস্ এ আসলে এমন নিয়ম নেই। কতটুকু হেল্প করতে পারবো জানিনা। হিস্টরিটা দেখি আগে তোমাদের।' বলে বুনো। তারপর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। আমরা যে সামনেই দাড়ানো এটা যেন জানেই না।
'একটু তাড়াতাড়ি দেখুন।' শেষ এ কথাটি বলে আকাশ মামা আমাকে নিয়ে বের হয়ে যায়। তার কণ্ঠ কেমন জানি রুঢ় শোনায়। হাসপাতালের বাইরে গলা শুকানো রোদ। ভেতরে এসিতে ঠান্ডা ছিল। বাইরে আসতেই ছ্যাৎ করে লাগল গরম রোদ। গ্রিল হয়ে যাবার মতন অবস্থা। লিমকা খেয়ে নিলাম আমি আর আকাশ মামা। রুবিও সাথে আছে। বড় মামা আজ মায়ের দেখাশোনা করছে। চিকিৎসা থেমে আছে। বাবা টাকা না পাঠানো পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছেনা। বুনো মেয়েটা কিছু করতে পারবে বলে মনে হয়না। এই শহর শুধু টাকার কথাই শোনে।
বাবা দেশে। বেনাপোল বর্ডার দিয়ে ঢুকেছে। একবারই ফোনে কথা হয়েছে আমার সাথে। বাবা আকাশ মামার সাথে সব আলাপ আলোচনা করছেন। তার চোখে বড় মামা একজন অপদার্থ কিসিমের মানুষ। আকাশ মামার ওপরেই তিনি ভরসা করতে পারছেন। আমরা কেউ কিছু তেমন জানিনা। বাবার এই কাজে মামা বিরক্ত হচ্ছেন। চেহারা দেখে বোঝা যায়। মুখে তেমন কিছু বলছেন না। শুধু বলছেন, 'আমারে অপদার্থ মনে করে? আমি অপদার্থ না। অপদার্থ না।' এই কথা বলার সময় তিনি প্রতিবারই ফোস ফোস আওয়াজ করেন নাক দিয়ে। মনে হয় খ্যাপা ষাড় কোন। বড় মামার নাকে পলিপ আছে। নাকের হাড় কিছুটা বাকানো। এমনিতে স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিলেই তিনি আওয়াজ করেন। রাগের সময় এই আওয়াজ বেড়ে হয় দ্বিগুন।

বাবার সাথে কথা বলার সময় আমার ফনিক্স সাইকেলটার কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল। সাহস পাইনি। সাইকেলের শরীরে ধূলো পড়েছে নিশ্চিত। কলকব্জায় জং পড়েছে হয়তো। গিয়েই গ্যারেজে নিতে হবে।
মাহবুবার আঁকাঝোকা চলছে কিনা জানিনা। অনেক অনেক এবড়ো থেবড়ো, অযথাই হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে। মাহবুবা কি আমার কথামতন কাজ করছে। ওর বাবা হয়ত এই সুযোগে মেয়ের ছবি আঁকাই বন্ধ করে দেবে কিংবা মাহবুবার মা খুঁজে নেবে নতুন কোন ড্রইং টীচারকে।
মাহবুবার জন্য আমি মাঝে মাঝে নিয়ে যাই নকুলদানা। চিনি আর বাদাম দিয়ে তৈরি। মেয়েটা মিষ্টির ভক্ত। মিষ্টি পেলে তার খুশি আর ধরেনা। বাড়িতে মেয়ে বলে তার আবদার তেমন একটা কেয়ার করেনা কেউ। আমি ছোটখাট দু-একটা ইচ্ছে পূরণ করে দিলে কতই না খুশি হয়! তার হাসি খুশি মুখটা বারবার মনে পড়ে যায়।
কীর্তনখোলার তীরে নতুন দোকান হয়েছে কয়েকটা। ফাস্ট ফুড এর। সেখানকার চাওমিন খুব পছন্দ মেয়েটার। কোন একদিন সাইকেলের পেছনে বসিয়ে ওকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। চাওমিন আর সবশেষে আইসক্রিম। খুব বেশি টাকা তো নয়!
দেশে গিয়েই এবার ওকে নিয়ে যেতে হবে। তবে মাহবুবার মা আমার সাথে মেয়েকে যেতে দেবে বলে মনে হয়না। মাহবুবার কলেজ শেষে গোপনে তাকে তুলে নিতে হবে।
রুবির জন্য বাবল গাম কিনে দেওয়া হয়। মেয়েটা দিনকে দিন বেয়ারা হয়ে উঠছে। আবদার না শুনলে বিরক্ত করে খুব। বাবল গামের বড় প্যাকেট কিনলেই কমিকস্ এর বই ফ্রি। রুবি কমিকস এর ভক্ত। চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিঙ্কী তার মাথা খারাপ করে দেয়। কমিকস্ এর বই কিনে কিনে জমানো এই মেয়ের শখ।
সময় তাড়াতাড়ি যাচ্ছে আজ। কোঠারি হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে আমরা অনেকক্ষন অপেক্ষা করি। বড় মামা আসে। জানায় মা সুস্থই আছে। খাওয়া দাওয়া করেছে। ডাক্তার আসেনি। পেমেন্ট ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত আসবেন বলে মনে হয়না।
আকাশ মামা সব শুনে আবার বুনোর সাথে কথা বলে। আমি আর বড় মামা দূর থেকে তাদের কথা শুনি। একটু কথা কাটাকাটি হয়। আকাশ মামাই চিৎকার করে। বুনো বোঝানোর চেষ্টা করে। লোকজন জড়ো হয় কয়েকজন।
সমাধান মেলে। পরশুর ভেতর সব পেমেন্ট ক্লিয়ার করা হবে এই শর্তে ডাক্তার মাকে দেখতে রাজি হন। বুনোর সাথে বড় মামার আলাপ হয়। বড় মামা মিশুক আছেন। কয়েক মিনিটের ভেতরেই তাদের আলাপ জমে ওঠে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে।
জানা যায় বুনোর নানাবাড়ি কুষ্টিয়াতে। তার মায়ের শৈশব কেটেছে বাংলাদেশেই। বুনো কখনও বাংলাদেশে যায়নি। দেশ দেখার খুব ইচ্ছে তার। বুনোর বাবা নিখোঁজ। রাজনীতি করতেন। অনেক অনেক আগে শিলিগুড়িতে একটা রাজনৈতিক মিটিং এ গিয়ে নিখোঁজ হন তিনি। অনেক চেষ্টা করেও তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।
অর্থের খুব একটা সমস্যা নেই পরিবারে। বুনোর বাবা বাড়ি করে রেখে গিয়েছেন। সেটাই ভাড়া দেওয়া হয়েছে। চলে যাচ্ছে এতে। তবুও বুনো চাকরি করছে। মেয়েদের ঘরে বসে থাকা তার একদম পছন্দ নয়। পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি চালিয়ে যাচ্ছে সুন্দর। বড় মামা বুনোর নাম্বার নিয়ে নেয়। যে কোন প্রয়োজনে ফোন করা হবে। বুনো হাসিমুখে বলে, 'অলওয়েজ। আমার নানার বাড়ির লোক তোমরা। হেল্প করতে পারলে ভালো লাগবে।'
চুপচাপ দর্শক হয়ে আমরা সব শুনি, দেখি। আকাশ মামা ব্যস্ততার কথা বলে একটু বের হন। তার রোগীর অবস্থা নাকি ভালো না। আমরা যেতে চাইলে 'না' বলেন।
আকাশ মামা চলে যাবার পর শুধুই অপেক্ষা। বুনোর সাথে গল্প শেষ হয় বড় মামার। তাকে খুব সন্তুষ্ট মনে হয়। আমাকে বলে, 'মেয়েটা কি সুন্দর দেখেছিস? পরিচিত ভালো ছেলে থাকলে মেয়েটার সাথে বিয়ে দিয়ে দেশে নিয়ে যেতাম। এত ভালো মেয়ে নিজের দেশে থাকা উচিত কি বলিস?' বড় মামার কথার আগামাথা বুঝিনা। এলোমেলো বকেন তিনি। 'হু, হু' করে যাওয়াই নিরাপদ। তাই মামার সব কথার উত্তরে 'হু' বলে যাই শুধু।
দেরি করে হলেও দুপুরে খেয়ে নেওয়া হয় সামান্য। রুটি আর ভুনা ডিমের ঝোল। এরপর আবারও কোঠারি হাসপাতালের নিচতলায় বনসাই গাছগুলোর পাশে রাখা সিটে বসে অপেক্ষা। আকাশ মামার খোঁজ নেই। ফোন দিয়েও পায়না বড় মামা। আমি আর রুবি বিকেলের চেহারা পালটানো দেখি। দুপুর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেলের দিকে যায় সময়। তারপর আবার বিকেল থেকে সন্ধে। কেমন কালশিটে পড়া আকাশ। কংক্রিটের দেয়াল ফুড়ে বের হওয়া অপুষ্টিতে ভোগা শহুরে মেঘ।
রুবির সাথে ঝগড়া, বেনি ধরে টান দেওয়া, রুবিকে কাঁদানো এসব করতে করতে অপেক্ষার সময়গুলো শেষ হয় কখন টের পাওয়া যায়না।
বাবার ফোন আসে দেশ থেকে। জানায় টাকা পাঠিয়েছে। আকাশ মামাকে বলা আছে। তিনি টাকা তুলবে। তার কাছ থেকে টাকা তুলে পেমেন্ট ক্লিয়ার করতে হবে। বাবার ঝামেলা যাচ্ছে। ধার দেনা করে যে অস্থির অবস্থা হয়েছে সেটা সামাল দিতে হবে আগে। আমি, বড় মামা আর রুবির মন ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসা হবে তাহলে। মা সুস্থ হোক।
খুশি মন নিয়ে বাড়ির পথ ধরি। বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে মামা আকাশ মামাকে খুঁজতে বের হবে। টাকা তুলতে হবে।

মামা বলে, 'আকাশ ছেলেটা ভালোই রে। ওর রোগীর জন্য একদিন কিছু নিয়ে যেতে হবে। তোর মায়ের জন্য মাগুর মাছ আর বাসমতী চাল এনেছে। আমরা কিছু নিয়ে না গেলে খারাপ দেখায়।'
আমারও মনে হয় কিছু একটা নিয়ে যাওয়া উচিত। বাড়ি পৌছাতে দেরি হয়না। আমাদের রুমের দরজা খুলতে গিয়ে দেখি দরজার তালা ভাঙা। মামা 'হায়। হায়।' বলে রুমের ভেতরে ঢোকেন। লন্ডভন্ড সব।
আমাদের লাগেজ খোলা। দামি যা কিছু ছিলো নেই কিছুই। লুট হয়েছে। রুবি দৌড়ে গিয়ে দেখে তার কমিকস্ এর বই ঠিকঠাক আছে কিনা। চোর নেয়নি দেখে সে খুশি হয়। সাত রাজার ধন যেন!
দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে সমস্যা হয়না। মামা বাবাকে ফোন দেয়। আমি দেখি ফোন কানে নিয়ে মামা কাঁদছে। বলছে, ' হায় হায় আমার বোনের চিকিৎসা হবে এখন কেমনে? অভিশাপ দিলাম আকাশরে। বিচার হবে।' বাবার ওপাশ থেকে বলা কথাও শোনা যায় স্পষ্ট। তিনিও কাঁদছেন। তার প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য। মামার কান্না দেখে রুবিও বোকার মতন ভ্যা করে কান্না শুরু করে।
আমি এই সবের মধ্যে নাই। ঘর থেকে বের হই রাস্তায়। আমার মায়ের চিকিৎসা হতেই হবে। চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।
এই অচেনা শহর কোলকাতায় বের হই আমি। আকাশ মামাকে খুঁজে বের করতে হবে।
আকাশ মামা, আপনি কই? আমাদের সাথে এমন কেন করলেন? জানেন তো, আমরা এমনিতেই অনেক দুখী।
আরও দুঃখ বাড়িয়ে কি লাভ। ধুর।

৫.

বেসামাল হাতের নাটাই,
উড়ছে তাই হাওয়াই মিঠাই।

বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয়েছে আগের থাকার জায়গাটা।
'মাছ মাংস ছাড়া জীবনে কিছু আছে নাকি? ঘাস, লতা-পাতা খাইতেছি। সম্ভব না। আমি পারতেছি না।' রেগে গিয়ে বলে বড় মামা।
'মামা, একটু ওয়েট। কয়েকটা দিন একটু সহ্য করো। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।' বলি আমি।
'কিচ্ছু ঠিক হবে না। এই বেগুন ভাজা আর পাতলা ডালই খেতে হবে। নিস্তার নাই। আমি শুকনা হয়ে যাবো। এক দিনেই আমার ওজন কমছে পাঁচ কেজি। শিওর।' বলে মামা। তার অবস্থা দেখে খারাপই লাগে।
'মামা ঠিক হয়ে যাবো তো। মাথা ঠান্ডা করো। একটু ঘুমাও।' বলি।
মামা আমার কথা শোনেন। ঘুমানোর চেষ্টা করেন। আমি নিশ্চিত তিনি ঘুমাতে পারবেন না। মাথায় রাগ আর পেটে ক্ষিধে নিয়ে ঘুমানো অসম্ভব। তিনি একটু পরেই আবার আমার সাথে এসব নিয়ে আলাপ করার চেষ্টা করবেন। কথার তুবড়ি ছুটিয়ে রাগ ঝাড়বেন।
মামার সাথে এসব নিয়ে আলাপে যেতে চাচ্ছিনা। তাই পালাই। ছাদে যাই।
বুনোর বাসার ছাদটা সুন্দর। দুপুরের পরপর পাটি বিছানো আছে। সাথে ছোট আকারের পাশ বালিশ। রোদ নেই। ছায়া ছায়া চারপাশ। বালিশ দেখে একটু ঘুমিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

গতকাল আর আজ অনেক ঝক্কি গেছে। মায়ের দেখাশোনা আমিই করেছি দুটো দিন। মামাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। মায়ের সেবার জন্য হাসপাতাল আর হোটেল করতে করতে মামা ক্লান্ত। তাই বাবার কথামতন তাকে ছুটি দিয়েছি।
বাবার সাথে কথা হয়েছে। অঘটনের কথা বলেছি। বলেছি, হাতে কোন টাকা পয়সা নেই। হোটেল ভাড়াও নেই।
বাবা সব শুনেছেন। ঠান্ডা গলায় বলেছেন, 'চিন্তা করিস না। দেখছি।'
বাবার আচরনে অবাক হইনি। লোকটা বিপদে পড়তে পড়তে এখন আর বিপদকে বিপদই মনে করেনা। ডালভাত হয়ে গেছে সব। ব্যাপারটা ভালো না মন্দ বুঝতে পারছিনা। জীবনটা কেমন জানি নাটকের মতন আজকাল। প্রতিদিনই অঘটন। ক্লাইমেক্স!
বুনোর বাসায় উঠেছি আগের জায়গা ছেড়ে। বিপদ কাটানোর একটা না একটা উপায় হয়েই যায়। এবারের মতন বুনোই বাঁচিয়েছে। জেনেছে আমাদের বিপদের কথা। মামা গিয়েছিল। করুণ কণ্ঠে বলেছে সব। মামার আকুতিতে বুনোর মন ভিজেছে। নিজে থেকে উদ্যোগী হয়েই আমাদের বাড়িতে তুলেছে।
আগের হোটেলের মালিক আকাশ নামের লোকটার পরিচিত। অঘটনের পর তার কাছে খোঁজ নিতে যাওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছে টাকা পয়সা নিয়ে উধাও হবার কথা। তিনি সব শুনে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং হুমকি দিয়েছে এ খবর বাইরে না চাউর করার। মামা তাই আর দেরি করেনি। হোটেল ছাড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। বুনোর বাসাটাও পাওয়া গেছে ঠিক এসময়েই।
ওরা থাকে বাড়ির দোতলায়। একতলায় আমরা আছি। দুটো রুম।
ভাড়া হচ্ছিল না। পড়ে ছিল দুই তিন মাস। রুপিতে মিললেও ফ্যামিলি পাওয়া যাচ্ছিল না ভালো আবার ফ্যামিলি ভালো হলে এই ভাড়া দিতে নারাজ।
তাই বুনো আমাদের নিয়ে এসেছে। অল্প কিছু টাকা দিতে হবে। এখনই টাকা দেবার তাড়া নেই। দেশ থেকে টাকা আসলেই হল। এতে হেল্প করাও হল আর কিছুদিন পড়ে থাকা ঘরগুলোর জন্য ভাড়াও পাওয়া গেল।
বুনোর মা আমাদের ঘর দিতে রাজি ছিলো না। ভিনদেশি মানুষকে হুট করে বিশ্বাস করাটা ঠিক না। বুনো চেঁচামেচি করে রাজি করিয়েছে। বুনো তার আদরের মেয়ে। আদরের মেয়ের কথা ফেলা যায়না। সামান্য ক্ষতি হলে হোক তবুও!
ছাদে হাটতে থাকি। এদিক ওদিক। চুপচাপ।
বাবার কথা মনে পড়ে। লড়াই করে যাচ্ছে লোকটা একাই। দেশে কি করছে এখন কে জানে! জানি চাচা, মামা, খালারা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে আজকাল বাবাকে। ধার নেওয়া হয়েছে অনেক। শোধ করা যায়নি। জমি জমা বেঁচে শেষ। শুধু বরিশালের বাড়িটাই আছে।
বাবাকে আজকাল খুব ক্লান্ত মনে হয়! কেমন পরাজিত! মাথাটা একটু নিচু করে কথা বলার চেষ্টা করে। দোষ নেই। যে ঝক্কি তার ওপর দিয়ে যায় তাতে টিকে থাকাই মুশকিল।
এই মানুষটাই কি ভয়ংকর ব্যাক্তিত্ববান না ছিল! তার ভয়ে সবাই কাঁপত। বাসায় দুনিয়ার নিয়ম কানুন। রাতে আটটার ভেতর খেয়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে হত! এরপর লাইট অন করার নিয়মই নেই। একদম ফজরের আযানের সময় উঠে বাবা হাঁটতে যেত। ফিরে এসে আমাদের ঘুম ভাঙানোর অত্যাচার। পড়াশোনা করানো। বাবার ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলতেও সতর্ক থাকা হত।
সেই মানুষ এখন একদম আলাভোলা। আস্তে করে কথা বলে। প্রায়ই এটা ওটা ভুলে যায়। কি করছে না করছে খেয়াল থাকেনা।
বাবার জন্য মায়া হয়। আমার কিছুই করার নেই। কেন যে কিছু করার নেই!
ডলার এনডোর্স নিয়ে ঝামেলাটা যাওয়া দরকার। বাবার সমস্যা হয়নি। চলে গেছে দেশে। সমস্যা আমাদের।
পাসপোর্ট নিয়ে ঝামেলা হবে। থানায় গেলেই আটকে যাবার সম্ভাবনা। টাকা পাঠাচ্ছে বাবা হুন্ডির মাধ্যমে। এটা নিয়েই যত গন্ডগোল। আমাকে খোলাসা করে বলা হচ্ছে না। বাবা মামাকে নতুন একজনের ঠিকানা দিয়েছে জানি। সেখানে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। টাকা বিষয়ক কিছু মনে হয়।
বাবা না বললে কি দরকার চিন্তা করার। আমার কি? নিজেই সামাল দিক না। আমার একটু অভিমান হয়।
'কতক্ষন ধরে আছো?' বলে বুনো। আজ তার অফ ডে। অফিস নেই। ক্লাসও নেই। আমার পেছনে এসে দাড়িয়েছে। একটা সাদা টি শার্ট পড়া আর সাথে ঢোলা পাজামা। এটাকে নাকি প্লাজো বলে। রুবির কাছে জেনেছি। বোনটা বড় হয়ে যাচ্ছে আমার!
'বেশিক্ষন না। এইতো।' বলি আমি।
'ভাতঘুম দিতে পারো। পাটি, বালিশ বিছানো।' বলে বুনো।
'না না। ঠিক আছি।' বলি আমি। কেমন সংকোচ কাজ করে কথা বলার সময়। মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় আমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। খুবই নগন্য মনে হয় নিজেকে। এই সমস্যা থেকে উত্তরনের উপায় কি জানা নেই।
'মায়ের জন্য মন খারাপ কোরোনা। পৃথিবী এমনই। শুরু শুরু আমারও বাবার কথা মনে করে খারাপ লাগত। এখন আর লাগেনা। মনেই পড়েনা বাবার কথা। বাবার জন্মদিনে মা নিয়ম করে কাঁদে। তারপর একটু পায়েস রান্না করা হয়। প্রতিবছর বাবা বলতে অই অতটুকুনই।' একটানা কথাগুলো বলে চুপ করে থাকে বুনো। জিহ্বা দিয়ে ঠোট ভেজায়।

আমি কি করবা বুঝিনা। কেন জানি আমার ইচ্ছা করে মেয়েটার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে। স্বান্তনা দিতে। এই দুপুরে মেয়েটার সব দুঃখ মুছে ফেলতে। ইচ্ছা পূরণ হয়না।
'এই, তোমাদের খাওয়া দাওয়ায় সমস্যা হয় তাই না?' বুদ্ধিমতী মেয়ে প্রসঙ্গ বদলায়।
'না। না তো।' জবাব দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যাই।
'আহা, ভদ্র হতে হবে না। মুখোশ মনে হয়। জানি ডাল, বেগুন পছন্দ হচ্ছেনা। বাই দ্য ওয়ে, চা খাবে?' বলে বুনো।
'চা। কোথায়?'
'আমার ঠাকুমা। অনেক চা খায়। দুধ আর বেশি বেশি চিনি। ডায়াবেটিস থাকলেও কেয়ার করেন না। মুড়ি ভিজিয়ে চা খেতে খেতে গল্প করেন। তার কাছে গল্পের খনি।'
'ওখানে গিয়ে চা খেতে হবে?'
'হ্যা।' বলে বুনো।
'আজ থাক। পরে।' আমার যেতে ইচ্ছে হয়না। টাকা পয়সা নিয়ে টেনশনটা আছে। দূর করা যায়না। এমন সব সময় ভালোও লাগেনা কোন কিছু।
'টেনশন? মা? টাকা পয়সা?' বলে বুনো। এই মেয়ের কাছে কোন কিছু লুকানো কঠিন মনে হয়।
'একটু টেনশন। টাকা পয়সা। পাঠাবে বাবা। একটা জায়গায় যেতে বলেছে। সেইফ কিনা জানিনা।' শুকনো মুখে বলি আমি।
'হুন্ডি?' বলে বুনো।
'হুম।'
'কেন যে করো এটা?' চিন্তিত মনে হয় বুনোকে।
'উপায় নেইতো। আমার হাতে কিছু নেই।'
'বুঝেছি। তুমি চাইলে আমিও যেতে পারি সাথে। এই শহরটা তোমার চেয়ে ভালো চিনিতো তাই।'
'ওকে।' আমি খুশি হয়ে যাই। সাহস পাই। মামাকে বলতে হবে যে বুনো যাবে। মামা রাজিই হবেন। বুনোকে তিনি পছন্দ করেন। যদিও আকাশ মামার ঘটনার পর তিনি এখন কাউকে বিশ্বাস করতে চাননা।
ছাদে থাকার কারনে আকাশটার অনেক কাছাকাছি আছি বলে মনে হয়। একটা প্লেন উড়ে যায়। মনে হয় খুব কাছ দিয়েই উড়ে গেল। প্লেনের ইঞ্জিনের আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়। এই আওয়াজে বুনো বিরক্ত হয়ে বলে,'এজন্যেই আমার শহর পছন্দ হয়না। একা থাকতে দেয়না। কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ ঠিক যেন হাজির।'
আমার মন্দ লাগেনা। প্লেনের মতন যন্ত্রদানব চলে যাবার ঠিক পর পরই পাই পাখির আওয়াজ। ঘুলঘুলিতে বাসা বেঁধেছে হয়ত। পেতেছে ছোট্ট সংসার। পাখির জীবন চেয়েছিলাম সবসময়। পাইনি।
রোদ এসে পড়ে গায়। কি বাধ্য! মিষ্টি হয়ে ছড়িয়ে যায়। পোষা একটুকুন রোদ যেন। কথা শোনে। শরীরে আরাম লাগে। হলুদ রোদ। রোদের পাগলামি আর ছায়ার সাথে খুনসুটি দেখি। দেখি কাকগুলোর তারের শরীরে ঠাই নিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া।
'রুবির সাথে জমে গেছে বুঝেছো। মেয়েটা কি সুন্দর। কিউট।' বলে বুনো।
'আমার তো মনে হয়না।' হেসে বলি আমি।
'ও, বোনের সাথে খুব দুষ্টুমি বুঝি?'
'একটু একটু। আমি শান্ত ছেলে। সব ঝামেলা ওই করে।'
'জ্বি না। তোমাকে দেখে মনে হয় না তুমি একদম শান্ত। ছুপা রুস্তম। তুমি খারাপই আছো। কিন্তু বোঝা যায়না।'
'বাজে কথা।'
'একদম না।'
আমাদের এই তর্ক, কথা বলা খুব ভালো লাগে। কেন জানিনা বুনোর এই সান্নিধ্য, কাছে থাকাটা শেষ না হোক এটাই চাচ্ছি মনে মনে।
'আমার বয়ফ্রেন্ড এর সাথে বের হতে হবে। অফ ডে তে মাস্ট। এছাড়া তো সময় দিতে পারিনা ওকে। বের হব। ওকে? থাকো।' বলেই ছাদ থেকে চলে যাওয়া শুরু করে বুনো।
আমি কিছু বলতে পারিনা। কেন জানি দমে যাই। বুনোর কেউ থাকলে আমার তো দমে যাবার কথা না।
বুনো যেতে যেতে হুট করে আবার ফিরে আসে। আমার কাছে এসে দাড়ায়। খুব কাছে। এতই কাছে যে আমি তার নিশ্বাস টের পাই। তার শরীরের ঘ্রান পাই। তার অগোছালো চুল এসে আমার মুখ জাপটে ধরতে চায়।
তারপর অদ্ভূত এক অনুভূতি। ঠিক কয়েক সেকেন্ড। পৃথিবী অন্যরকম হয়। স্বর্গ হয়। ফাগুন হয়।
এরপরই চলে যায় বুনো। দৌড়ে। লজ্জা পেয়ে। তাড়াহুড়ো করে।
আমি কয়েক সেকেন্ডের ঘোর থেকে ফিরতে পারিনা। কি হলো এটা? এমন তো কথা ছিলোনা। বুনোর মাথা ঠিক আছে তো?

এমন আমার সাথে কখনও হয়নি। এমন সুন্দর কিছু। এমন ভালো লাগার।
সরি হয়েছিল। মাহবুবার সাথে। একদিন।
ভুলে যেতে চাই।
সেই দিনটার কথা খুব করে ভুলে যেতে চাই।

৬.

আলোতে যেই খবর,
অন্ধকারে সেই কবর।

গোলাগুলিতে মারা গেছে একজন কিছুদিন আগেই।
গোলাগুলি আমাদের শহরেও হয়। ছাত্ররাজনীতি। এটা ওটা ঝামেলা। গুলি সহজলভ্য মনে হয়। কিছু একটা হলেই ঠুসঠাস, ফুসফাস। ক্লাস বন্ধ। আমরা সবাই ক্লাস ছেড়ে বাইরে। তারপর বন্ধুরা একসাথে মিলে টাকা তুলে কলিজা সিঙ্গারা খাওয়া আর সাথে নিজাম চাচার চা।
ক্লাস বন্ধ হলেও কোচিং চলবেই। এতে কোন মাফ নেই। না গেলে খারাপ ব্যবহার, নাম্বার এদিক ওদিক। তাই সবাই মিলে এই স্যার ওই স্যারের কাছে ছোটা হয়। মাসে আটশ টাকা বেতন। এক এক ব্যাচে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছাত্র ছাত্রী। এখানেই প্রেম ভালোবাসা। পড়তে পড়তে ভালো লাগা। নোট নিতে নিতে চোরা চাহনি। বিরক্ত করা। চিঠি দেওয়া, ফোন নম্বর। কখনও 'না' শোনা। অভিমান। বেশি হলে চড়-থাপ্পর। রোজকার গল্প সবার।
কোন কোন একদিন ফুটবল খেলার টুনার্মেন্ট। মাঠের চারপাশে শ'খানেক মানুষের ভিড়। বাদাম আর ভেলপুরীওয়ালার রমরমা ব্যবসা। বিট লবন কম হল কেন? পুরীতে টক তেতুল দেওয়া হলনা কেন? এই নিয়ে ঠোকাঠুকি। আবার এক এক দিন ঘুড়ির লড়াই। আমাদের ফরিদ মাঞ্জা দেওয়ায় সেরা। কাঁচের গুড়ো, কবুতরের পায়খানা, আলতা সহ আরো কি সব দিয়ে সুতো ধারালো করে সে। কঠিন মাঞ্জা। অন্য কোন ঘুড়ির সুতো কাছে এসে টাচ করলেই ঘ্যাচ করে কাটা পড়বে।
থমকানো শহর, কাজের চাপ নেই, কোথাও পৌছানোর তাড়া নেই এমন জায়গাটার জন্য মন কাঁদে। কবে যাবো?
বুনোর সাথে তার ছেলে বন্ধুও আছে। আমরা এসেছি হুন্ডির টাকা তোলার জন্য এক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলতে। কলকাতার অনেক ক্ষমতাবান লোক। ধনী। দুটো মার্কেট তার। সিনেমাহলও আছে। একসময়ে প্রতাপশালী গুন্ডা ছিলো। বুনোর ছেলে বন্ধুর পরিচিত। তার কাছে শুনে বুনো আমাদের জোরাজুরি করে নিয়ে এসেছে।
ছেলেটার নাম রজত। চেহারা সুবিধার না। টাউট বাটপার ছাপ আছে। এটা আমার কথা না। মামা বলেছে। মামা ছেলেটাকে একদমই পছন্দ করতে পারছে না। বলছে, 'বুনো মেয়েটার জন্য আফসোস হচ্ছে রে। কি সুন্দর পুতুলের মত মেয়ে। সুন্দর মেয়েদের মাথা খারাপ হয় মনে হয়। নাহলে এমন ছ্যাচড়া টাইপের ছেলের সাথে প্রেম করে কেউ? এই রিলেশন টিকবে না। বলে রাখলাম, দেখিস?'

সবসময়ের মতই মামার কথার জবাবে কিছু বলিনি আমি। তাছাড়া বুনোকে নিয়ে ভাবছি। তার আচরনে অবাক হয়ে আছি। ছাদের ঘটনাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছে সে। ছেলে বন্ধুর গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। ভালোবাসাবাসি চলছে।
আমার কি করা উচিত? কিছু করা উচিত না। মায়ের চিকিৎসা করতে আসা ছেলের প্রেম, ভালোবাসা মানায় না। আর বুনোকে আমি ভালোবাসি কিনা এটা নিয়ে নিজেই বিভ্রান্ত। ভালো লাগা হতে পারে বড় জোর। এইতো।
বুনোকে চাইতে পারিনা। আরেকজনের প্রতি অবিচার করা হবে। সেটা অপরাধ হবে। কঠিন অপরাধ। এমনিতেই এক অপরাধ থেকে লুকোতে চাচ্ছি। পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পারছি না। সেখানে অন্য কিছু নতুন করে ঠিক নয়। একদম ঠিক নয়।
'মুভি দেখি চল। সন্দীপ মুখার্জি বড় মানুষ। টাইম দিয়েছে ঠিকই কিন্তু দেখা করতে ঢের দেরি হবে মনে হয়। প্রায় ঘন্টা দুই।' বুনোকে কথাগুলো বলে রজত।
'মুভি? শিওর?' বলে বুনো। আমি, মামা আর রুবি ওদের কথা শুনি।
'হুম। খাওয়ার জন্য কোথাও বসা যায় অবশ্য। কিন্তু তোমার বাসা থেকে বের হবার সময় তো গলা অব্দি গিলেছি। ক্ষিধে নেই। মুভি দেখলেই সময়টা কাটবে।' বলে রজত।
এই কথা বলার সময়ে মামাকে দেখি মুচকি হাসতে। পাতলা ডাল আর বেগুন ভাজা খেয়ে এই ছেলে বলছে গলা অব্দি গিলেছে। এটাই যে হাসার কারন বুঝতে সমস্যা হয়না। বুনোর বাসায় খাবার বলতে এই'ই।
'চলো তাহলে।' কথাটা বলে বুনো আর রজত সিনেমার টিকেট কাটতে যায়। আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করেনা। সিনেমা দেখবো কি দেখবো না জানতে চায়না। নিজেরাই কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।
মামার কুচকানো ভ্রু দেখে মনে হয় বিরক্তি বেড়েছে তার। বাড়াটাই স্বাভাবিক।
টিকেটের জন্য লম্বা লাইন। এ শহরের মানুষ সিনেমার জন্য পাগল।
আমার লাইনে দাড়ানোর অভ্যেস আসে। সংসারের কাজ বলতে ব্যাংক এ লাইনে দাড়ানো পর্যন্তই। ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা তোলার জন্য বহুবার ব্যাংকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে। মনে হয় মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ বেঁচে আছে সঞ্চয়পত্রের কারণে। মাস শেষে অতিরিক্ত এই কয়টা টাকা সাহায্য করে খুব।
টিকেট পাওয়া যায়। প্রায় বিশ মিনিট। নিজেরাই কষ্ট করে লাইনে দাড়িয়ে সবার জন্য টিকেট আনে রজত আর বুনো। ইংরেজি ছবি একটা। আমরা হলে ঢুকি। সাথে নেওয়া হয় পপকর্ন আর কোক। রুবি এই প্রথম হলে ঢুকেছে ছবি দেখতে। খুশিতে লাফাচ্ছে সে। এক ঘন্টা পয়ত্রিশ মিনিটের যে ছবি দেখে আমরা বের হই তার কথা না বলাই ভালো।
মামার চেহারা, কান, নাক লজ্জায় লাল। রুবি কিছুই বুঝতে পারছে না। তার চোখ বেশিরভাগ সময়েই আমি ঢেকে রেখেছি। শব্দ তো ঢাকা যায়না। রুবি সেটা নিয়েই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। আমার মেজাজ খারাপ। বুনো কি আক্কেলে এমন বাজে ছবি দেখালো বুঝলাম না। ছবি জুড়ে নর নারীর যেসব নির্লজ্জ কান্ড হয়েছে সেসব নিয়ে ভেবে গা রি রি করছে। বলার মত না। একা দেখলেও নাহলে হতো...ছি!
দেখা হয় সন্দীপ মুখার্জির সাথে। বড্ড ভালো ব্যবহার করেন। ক্ষমতাবান লোক দেখেই বোঝা যায়। তিনি হুন্ডির ব্যাপারে সব শোনেন। তারপর বলেন, 'দেখি কি করা যায়। ঝামেলায় জড়িয়ে গেছেন আপনারা। গোলাগুলিতে কিছুদিন আগেই ওখানে মারা গেছে একজন। রওনা দিয়ে দ্যান এখনই। গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি।'
এতটুকুন কথা বলেই লোকটা চলে যায়। চা-বিস্কুট খেয়ে যেতে বলে। আমরা খেয়ে রওনা দেই। একটা জিপ। সন্দীপ মুখার্জির লোকই আমাদের নিয়ে যায় গন্তব্যে। ঘিঞ্জি জায়গা এক। চিপা গলি। একটা জায়গার পর আর গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়না। দেখেই মনে হয় চারপাশের মানুষগুলো ভয়ংকর। কোন না কোন অপরাধের সাথে জড়িত। হেটেই রওনা দেই।
ময়লা, আবর্জনা ডিঙিয়ে, মানুষের ভিড় পাশ কাটিয়ে একটা ভাঙাচোড়া দোতলা বাড়িতে যাই। সন্দীপ মুখার্জির লোক পথ দেখায়। বলে, এটা কলকাতার সবচেয়ে জমজমাট এবং বড় জায়গা যেখানে প্রতিদিন কোটি রুপির ওপরে হুন্ডির লেনদেন হয়। পরিচয় করায় ছাব্বিশ কি সাতাশ বছরের একটা ছেলের সাথে। এখানকার প্রধান। আগে বাবা ব্যাবসা দেখতো। অসুস্থ হওয়ায় ছেলে দেখছে সব। কি আত্মবিশ্বাসী! হাতে সোনার রোলেক্স। আয়রন করা দামি শার্ট। ঘরের ভেতরেও সানগ্লাস পড়ে আছে। মাঝ আঙ্গুলে আংটি। আচার-আচরন, ভাবে নিজের ক্ষমতার জানান দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। এত কিছুর ভেতর সবার আগে চোখে পড়ে তার পাশে টেবিলের ওপর রাখা রিভলবারটা। ভয় হয়। সাথে রুবিও আছে।
কোথায় টাকা পাঠালো বাবা? বারবার ভুল করা কেন? সন্দীপ মুখার্জি সুবিধার লোক না। এখন মনে হচ্ছে বুনোর ছেলে বন্ধুর কথা শুনে তার কাছে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।
পরিচয় করিয়ে দেবার পরেও ছেলেটা আমাদের সাথে কথা বলেনা। চোখের ইশারায় এক লোককে আমাদের অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যেতে বলে। ছোট ক্লায়েন্ট বলেই হয়ত তার এমন অবহেলা। আমাদের সামনেই লাখ লাখ টাকার লেনদেন হচ্ছে। রুপি আর টাকার বান্ডিল। সবাই গোনায় আর ব্যাগে ভরতে ব্যস্ত।

‘ইধার আইয়ে। ইধার।’ বসের কথা অনুযায়ী এক লোক আমাদের ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে যায়। মামা আর সন্দীপ মুখার্জির লোকটাকে আলাদা করে ঘরের এক কোনায় নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে। মামা পকেটা থেকে একটা নোট বের করে। নোটের গায়ের কোন একটা নাম্বারের সাথে এই লোক তার পকেট থেকে বের করা নোটের নাম্বার মেলায়। আমি এইসবের কিছুই বুঝিনা। সব ঠিকঠাক বুঝে মামার হাতে টাকা তুলে দেয় লোকটা। বলে,‘গিনকে লেজিয়ে।’ মামা গুনতে বসে যায়।
ঠিক এমন সময়েই সিনেমার মতন ঘটে। হইচই। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া লোকের মুখে কথা শুনে বুঝি পুলিশের ঝামেলা। বখরা নিয়ে সমস্যা কোন। ধরে নিয়ে যাবে। থানায় জায়গা হবে সবার। বস ছেলেটাকে দেখি পুলিশের সাথে বাগবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়তে। হাতে রিভালবার। সাহস বটে!
লোকজন সুযোগ বুঝে এদিক ওদিক পালায়। পালায় সন্দীপ মুখার্জির লোকটা। রজতকেও দৌড়ে বের হয়ে যেতে দেখি। মামা হতভম্বের মতন বসে। হাতে টাকা। গোনাও শেষ হয়নি। রুবি শুরু করে ভ্যা করে কান্না। বুনো তার ভয় ভাঙাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর আমি? নিজের ভ্যাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে হাসি। জেলে যেতে হবে নাকি গুলিতে মারা পড়বো এসব নিয়ে ভাবনা নেই। ভয়ও নেই। ভাবছি ভাগ্য কতটা বিরূপ হলে এভাবে হাতে টাকা এসেও বারবার হাতছাড়া হয়ে যায়। এ’তো আমার মায়ের চিকিৎসার জন্য আনা টাকা। খারাপ কিছু তো নয়। কার অভিশাপ?
হাতাহাতি শুরু হয়েছে মনে হয়। লাঠি দিয়ে মানুষ পেটানোর আওয়াজ পাই। মানুষের কান্না, ব্যাথায় চিৎকার। কেউ একজন চিৎকার করে বলছে, ‘তালতলা থানায় ভরবো সব। সবগুলারে...শালা বাইন...।’
পালানো উচিত। রুবি আছে তো সাথে। পালানো উচিত।
মামা, আমি, বুনো, রুবি পালানোর পথ খুঁজি। দৌড়াই।
ছুটতে ছুটতে বের হতে গিয়ে চোঁখে পড়ে আকাশ মামাকে। আচমকা। এক পলকের জন্য।
আমি দৌড় থামিয়ে চিৎকার করে বলি, ‘বড় মামা, অই লোকটা। আকাশ মামা। বেঈমান।’
হুজ্জোত, ঝামেলা, হুড়োহুড়ির ভেতর মামার কিছু শোনেনা। আমার হাত ধরে টান দেয়।
বলে, ‘দৌড়া। দৌড়া।’
আমি দাড়িয়ে থাকি। আমার আকাশ মামাকে ধরা দরকার। আমার মায়ের চিকিৎসার টাকাগুলো উদ্ধার করা দরকার।
লোকটাকে জিজ্ঞেস করা দরকার, ‘কেন করলেন? মানুষ তো এখনও এত খারাপ হয়নি। তাই না?’
ধরার জন্য দৌড় দেই।

৭.

পরগাছা সাধনায় ফুল্ল হয়,
কানের দুল হয়।

রোগীর নাড়ী বন্ধ হয়ে গেছে।

মায়ের পাশের বেড। গল্প করেছে অনেক আগেরদিন দুপুরবেলা। সুস্থ হয়ে উঠছিল। হাসি হাসি মুখে রাতে ঘুমুতে যাবার আগে মাকে বলেছিল, 'দোআ করবেন। তাড়াতাড়ি এই মরার হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় যেতে চাই। কত কাজ!'
খুশি দেখলে কাউকে নিজেরও মন ভালো হয়ে যায়। মায়ের মনটাও ভালো ছিল। মনে হচ্ছিল তিনিও একদিন সুস্থ হয়ে উঠবেন।
কিন্তু এসবের আশায় ছাই ঢেলে রাতের বেলা মারা গেল পাশের বেডের মহিলা রোগীটা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল শুরুতে। বারবার পানির পিপাসা পাচ্ছিল। 'পানি। পানি।' বলে চেঁচাচ্ছিল। বড় বড় চোঁখ দেখে মনে হচ্ছিল খুলে বের হয়ে আসবে।
তারপর শেষ। মরে যাওয়ার জন্য এই এতটুকুনই। মানে কি এসবের? কই চলে যাওয়া? কেন?
মায়ের মন খারাপ। মৃত্যু কখনই আনন্দ দেয়না। কষ্ট দেয়, দুঃখ দেয়, ভয় ধরায়।
মা ভয় পায়। মৃত্যুর কাছাকাছি থেকেও, মৃত্যুর সাথে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করেও তিনি ভয় কমাতে পারেননি।
মৃত্যু আমাকেও ভাবায়। ডাক্তার বিশ্বজিত ক্রিটিকাল কেয়ার সেন্টারে নিয়ে গিয়েছিল একদিন।
সেদিন খুব কাছ থেকে দেখেছি সব। বিষাদে ভরা সময়। মাস্ক, এপ্রন, জুতোর ওপর পেচানো পলিথিন সহ আরো কি কি সব নিয়ে ঢুকেছি ঘরে। জীবাণুর ভয় নাকি অন্য কিছু? ডাক্তার বোঝালেন প্রত্যের বেডের কাছে ছয়টা ক্যামেরা ফিট করা। অনেক রোগীই আওয়াজ করতে পারেনা, কথা বলতে পারেনা। তাদের ঠোটের ওঠানামা দেখে, ইশারায় বুঝে নেওয়া যায় তারা কি চাচ্ছে।
অনেকগুলো সজাগ চোখ তৈরি থাকে তাদের প্রতিটা মুহূর্তের প্রয়োজন বোঝার জন্য, মেটানোর জন্য।
এক রোগীকে দেখিয়ে ডাক্তার বলছিলেন, 'এই তো মারা যাবে কিছুক্ষনের ভেতরেই। চেষ্টা করেছি। হোলোনা।' রোগীর বয়স বড়জোর ত্রিশ কি বত্রিশ। কাচের দেয়ালের আরেক পাশ থেকে বুঝলাম ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়ছে। চোখ বন্ধ। কিন্তু একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলল যেন! কেমন লাগবে এমন একজনের সামনে দাড়াতে যে আর কিছুক্ষন পর পৃথিবীতে থাকবে না। সেদিন আর কিছু খেতে পারিনি। রাতে ঘুম হয়নি। মৃত্যু ভয় ধরিয়েছে। ভয় পেয়েছি।
একদিন মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখেই এই অবস্থা আমার। মায়ের না জানি কি হয়! প্রতিদিনই মৃত্যুর সাথে লড়াই। অপ্রত্যাশিত, ঠিক নেই কিছুই। অদ্ভূত। পৃথিবীর সবকিছু আমার এলোমেলো লাগে।
মন খারাপ করা মা রাতের খাবার খায়। এরপর আমি বের হই। বাড়ি ফিরতে হবে। রুবি অপেক্ষা করে আছে।
রাত। বাইরে চাঁদ উঠেছে। মুগ্ধ হয়ে মরে যাবার ইচ্ছে জাগার মতন চাঁদ। আমার নানুর ভাত খাবার থালার মতন চাঁদটা। অনেক বড়। অনেকটা বড়। মাটির পৃথিবীর কাছাকাছি খুব।
কলকাতার চাঁদ সুন্দর। তবে 'আপন ভিলা'র ধারে কাছেও যায়না এর সৌন্দর্য। দেশে রাত হলেই বাসার সামনে প্রায়ই জড়ো হত একরত্তি চাঁদের আলো । টলমলে জল, রূপোর গহনা যেন। এমন মায়া মায়া আলো মাহবুবার চোখে দেখেছি। এই এক্ষুনি নেমে আসবে ঝরনাধারা এভাবে। বড় আদর লাগে। এসব সময়ে মাহবুবাকে বকি। চাই একটু কাঁদুক। চোখ ভিজুক, গাল ভিজুক। চোখের জলের রেখা গালে শুকাক। সুন্দর। অপার্থিব সুন্দর।
আমাদের বাড়ির সামনে চাঁদের এই আলোতে জোনাকি পথ হারাত। জ্বলা-নেভা না থাকলে মনে হয় তাদের আলাদা করে ঠাওর করাটাই কঠিন হত। দুই আলো একই রকম যে!
কোটারি হাসপাতালের সামনের রাস্তা দিয়ে আমি অযথাই হাটতে থাকি। ব্যস্ত কলকাতার এই রাস্তা এখন কেন জানি থমকে আছে। কারণ চাঁদের আলো কি? সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য, ছুঁয়ে দেখার জন্য মানুষকে কি থমকে যেতে হয়? শহরের সমস্ত মানুষকে কি এই আলো সমানভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে? মনে হয় না।
জীবন তো এখন ধার করা। আমরা মুগ্ধ হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। সব শিখিয়ে, পড়িয়ে দেয় টিভি, সিনেমা, নাটক, বিজ্ঞাপন। কিভাবে ভালোবাসি বলতে হবে, কিভাবে বুলাতে হবে মমতার পরশ, কিভাবে দুঃখ পেতে হবে, আনন্দের সময়ে দু-হাত ছড়িয়ে দিতে হবে আকাশে সব, সব আমরা শিখে নিচ্ছি, বুঝে নিচ্ছি। মেকি লাগে। পরিমিত সব। ভালোবাসার সেই তীব্রতা কই? দুঃখের সেই গভীরতা আজ আর হাহাকার তৈরি করেনা বুকে। সব যেন জানা। অপরকে জানানোর জন্য। ছোট করার জন্য। বড় হবার জন্য। শো অফ যাকে বলে। কথা বলার ক্ষমতাও নেই। শিশু মন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোর চেয়ে দামী কোন শো-পিস, ঝাড়বাতির আলো জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রেয়সীকে আলিঙ্গন, কাছে টেনে নেওয়া, স্পর্শ করা সব যেন নিয়মমাফিক। বড্ড তাড়াহুড়ো। ফুরিয়ে যাবে এমন। সব সম্পর্কেই হিসেব নিকেশ। লোকসান করা যাবেনা। প্রাণ নেই। পৃথিবীতে প্রাণ নেই।
অনেকক্ষন পর পর এক একটা গাড়ি দেখা যায়। কোলকাতায় লোডশেডিং নেই বললেই চলে। রাস্তাঘাটে আলোর কারসাজি সারারাত। তবুও আজ যেখানটায় হাটছি সেখানটা অন্ধকার লাগে। ছমছমে, নীরব। একটা বড় গাছের নিচে শাড়ি পড়া একটি মেয়ে। শাড়ি পড়ে আজকালকার মেয়েরা? এখনকার মেয়েরা? কারো জন্য অপেক্ষা করছে এই মেয়ে। আমি একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেই। মেয়েটার খারাপ না লাগুক। ভয় না পাক এই রাতে। পাশ কাটিয়ে যাই তাই তাড়াতাড়ি।
মাহবুবাকে শাড়ি পড়লে দারুণ লাগে। একবারই দেখেছি। মেয়েরা শাড়ি পড়লেই মেয়ে থেকে নারী হয়ে ওঠে। পূর্ণতা পায়। কেমন লজ্জাবতী লতার মতন ধীরপায়ে সেদিন এসেছিল। পায়ে আলতা দেওয়া। হাতে ইমিটিশানের গোটা দুই চুড়ি। আকাশি রঙ এর সিল্কের শাড়িটা সামলানো সে'কি কঠিন। শাড়ির পাড়ের নিচ ঘেষে যাওয়া সাদাটে সায়া। গায়ের রং এর সাথে মিশে যেতে চায়।

শরীরটা বাকিয়ে এই এতটুকুন হয়ে যাবার চেষ্টা। কোমরে অযথা মেদ নেই। ছবি আঁকতে ব্যস্ত মাহবুবাকে দেখেছি গোপনে। অনেকক্ষন ধরে। এটা অপরাধ জেনেও থামতে পারিনি। মেয়েটা সাধারণ সুন্দর জানিতো। কিন্তু শাড়ি পড়ে অপরূপা হয়ে উঠবে সেটা জানা ছিলোনা।

'আরে তুমি?' অন্ধকারে পাশ থেকে বলে একজন। ট্যাক্সির ভেতর। বসে ছিল। চাঁদ এখন মেঘের আড়ালে। হুট করেই আলো গায়েব হয়ে অন্ধকার ভর করে। আর এদিকটায় গাছ গাছালি বেশি। ভাবি, এই লোকের অন্ধকারে কি? ভয় পাই।

'জ্বি'। আমি না চিনে, না বুঝে বলি।

'আমি রানা। অন্ধকারে বুঝতেছ না।' বলেই লাইটারের আগুন জ্বালায় লোকটা। আগুনের আলোতে চিনতে পারি। পরিচিত রানা ভাই। বন্ধুর বড় ভাই। কোলকাতায় কি? দেশের বাইরে আসলে জানার তো কথা আমার। বন্ধু বলেনি।

'আমার বোনের হাসবেন্ড অসুস্থ। মাথায় রক্ত উঠছে। ব্রেন স্ট্রোক ফেসট্রোক মনে হয়। মরার মতনই। বোনের জোরাজুরিতে কলকাতা আসছি। গতকালই। তোমার মায়ের কি অবস্থা?' একসাথে অনেক কথা বলে ফেলে রানা ভাই। ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে সিগারেট ধরায়।

আমি সিগারেট খাইনা সেটা জানে। তাই সাধাসাধির ঝামেলায় যায়না।

'আছে আর কি মা। আপনার সাথে কে কে আসছে?' বলি আমি। কৌতুহলী হই। কাছের মানুষ, দেশের মানুষ পেয়ে ভালো লাগে।

'আমি আর দুলাভাই। আর আইনা লাভ কি? অযথা খরচ। রেজাল্ট তো জানা। বাঁচবে না।'

'ও।' আমি বলি।

'কলকাতায় আইসা দেখি দুনিয়ার দেশের মানুষ। এত মানুষ অসুস্থ দেশের কে জানত। এই শহর তো চিকিৎসা দিয়া বহুত পয়সা কামায় কি বলো?'

'তা সত্যি' স্বীকার করে নেই।

'দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো হইলে কি আর এতদূর আসা লাগে? উঠছো কই তোমরা?'

'পরিচিত এক বন্ধুর বাসায়।'

'বন্ধু? এইখানে বন্ধু কই পাইলা? হে হে।' এই কথা বলতে না বলতেই ট্যাক্সি ক্যাবের ড্রাইভার চলে আসে। কাছাকাছি কোথাও ছিলো মনে হয়। এসে রানা ভাইকে জানায় পেয়েছে। পেপার এ মোড়ানো একটা বোতল দেয় রানা ভাইয়ের হাতে। দেখি রানা ভাই খুশি হয়ে উঠেছে। তারপর সে আমাকে জোরাজুরি করে ওঠায় ট্যাক্সিতে। আমি না করলেও শোনেনা। বলি, বাড়ি যেতে হবে। অপেক্ষা করে আছে সবাই। রানা ভাই শোনেনা। নাছোড়বান্দা। বলে, রাতে খাবার পর ট্যাক্সিতে পৌছে দেবে। বাধ্য হয়ে যেতে হয়। দেশের বড় ভাইকে না করতে পারিনা।

পথে যেতে যেতে এই কদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা শোনে রানা ভাই। সব বলি। মায়ের অসুস্থ হওয়া, আকাশ নামের লোকটার কথা। বলি যে টাকা নেবার পরেও এক জায়গায় দেখেছি তাকে। কিন্তু পুলিশের ঝামেলা কারণে ধরতে পারিনি। লোকটাকে পেলে শাস্তি দেবার ইচ্ছে নেই। টাকা ফেরত পেলেই হল। এটাও জানাই।

দেখি অনেক কিছুই জানে রানা ভাই। কিভাবে জানলো জিজ্ঞেস করিনা।

একটা সস্তা হোটেলে এসে পৌছায় ট্যাক্সিটা। ট্যাক্সিওয়ালাকে বকশিস দিয়ে বিদায় করেন রানা ভাই। হোটেলের নিচেই খাবার দোকান। সেখান থেকে বাটার দেওয়া মোটা রুটি, মুরগির মাংসের গ্রিল আর গুর্দা কাবাব নেওয়া হয়। রানা ভাই আরো কিছু কেনাকাটা করেন। বাদাম, ছোলা, চানাচুর আর সোডা।

হোটেল রুমে ঢুকে তিনি বয়কে আইস আনতে বলেন। পেপার খুলে মদের বোতল বের করেন। আমাকে সহজ করার জন্য বলেন কাবার আর রুটি খেতে। শিল্পীর মতন যত্নের সাথে লেবুর রস, পেয়াজ, কাঁচা মরিচ, ছোলা, চানাচুর আর বাদাম মেশান একসাথে। সোডা ঢেলে নেয় গ্লাসে। সাথে মদ। সব কাজ শেষ হলে একটু গুছিয়ে বসেন। তারপর গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'টেস্ট করবা নাকি একটু?'

'না। না। খাই না।' আমি একটু জোর গলায়ই বললাম।

'আরে বিদেশ বইসে এসব করলে দোষ নাই। ইবাদত বন্দেগীতে এফেক্ট করেনা। দেশে হইলেই সমস্যা। টেস্ট করো। ভালো লাগবে গ্যারান্টি।' এই বলে রানা ভাই মুখের কাছাকাছি গ্লাস নিয়ে আসে। উৎকট গন্ধ। ঢেকুর দিলে এমন অম্ল ঝাঁঝওয়ালা ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

'আমি না। দিবেন না রানা ভাই। খাই না।' বলে মুখ সরিয়ে নেই দ্রুত। অপুদাও দেখেছি মদ একা খেতে পারেনা। সঙ্গী থাকলে আরাম পায়। আমাকে সেকি জোর করেছিল একদিন! অপুদাকে না করেছি। এরপর আর কিছু বলেনি।

আমার আচরণে রানা ভাই হাসে। জোরে শব্দ করে। হা হা হি হি। এক পেগেই ধরেছে।

'তুমি তো কচি মিয়া। ধুর। মদে একলা হইলে মজা নাই। সাথী লাগে। তোমারে তো এই জন্যই আনলাম।' এই কথা বলে সে কান্না শুরু করে। কান্নার কারণ জানিনা। জানতেও চাইনা। আমার বাসায় যাবার তাড়া। কই এসে ফাঁসলাম!

‘রানা ভাই, আমার যাইতে হবে।’
‘আরে ওয়েট। কই যাবা? আমি একলা থাকবো? তুমি তো পাষাণ। শোনো, বোনটারে নিয়া দুঃখে আছি। কি হবে জানিনা। দুলাভাই এর এ কি কঠিন রোগ! বয়স তো অল্প তারপরও। লোকটাও ভালো। ওপরওয়ালা দুনিয়াতে ভালো লোক রাখেনা না রে ভাই। লোকটা মরলে বোন কই থাকবে? টেনশন। টেনশন।’
‘শান্ত হন রানা ভাই।’
‘আর শান্ত, শান্ত। বোনটা এমন পোড়াকপালি ক্যান আমার?’ কথা বলে মাথার চুল টানতে থাকে রানা ভাই। তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। পাগলামি করে নিজেই আবার শান্ত হয়ে যায়। নেশায় মনে হয় তার এমনই হয়। আমার ভয় লাগে।
‘আমি যাই রানা ভাই। সবাই টেনশনে পড়বে নইলে।’
‘আরে থামোনা। তোমার বড় ভাই আমি থাকতে বলতেছি আর তুমি খালি যাও যাও লাগাইছো। রিসপেক্টই করোনা আমারে। যাবা তো। আমি আটকাইছি? কথা আছে। কথা শেষে যথায় ইচ্ছায় তথায় যাও আটকাবোনা। শোন, তোমার বাবার ব্যাপারটা নিয়া কথা বলা হয় নাই। চাকরি নাকি নাই উনার। খোলাসা করো তো বিষয়টা শুনি।’
রানা ভাইয়ের কথা শুনে আমি বোকা হয়ে যাই। কিভাবে চাকরি যায়? কি হচ্ছে? কি হবে? নেশাগ্রস্থ মানুষ তিনি। ভুল বলতে পারেন। আমি কথা বলিনা। বলার মতন কি আছে? জানিনা তো কিছু। আমি অপেক্ষা করি। রানা ভাই বলুক। তার কথা শোনা দরকার।
‘সাসপেন্ড হইছে শুনলাম। পত্রিকায় আসছে। এলাকায় তো হাসাহাসি মিয়া। ঘুষ টুস এর ব্যাপার নাকি? তোমার বাবা তো লোক ভালো শুনছি। অফিসের পলিটিকস্ থেকেও হইতে পারে। ফাসায় দিছে। কি বলো?’ রানা ভাই বলে। আমার মুখ থেকে কিছু শুনবে এই আশায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার কিছু বলার নেই।
আমি রানা ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করতে চাইনা। আমি জানি এই কথা সত্যি নয়। সত্যি হলে আমাদের অনেক বিপদ। সে বিপদ সামাল দেবার সার্মথ্য আমাদের নেই বলেই মনে হয়।
‘আমি যাই রানা ভাই। আটকায়েন না। আরেকদিন কথা হবে। গেলাম।’ এই বলে বের হই। রানা ভাই কি বললো, আটকানোর চেষ্টা করলো কিনা এসব দেখিনা। জাস্ট বের হয়ে যাই।
রাত হয়েছে। পথঘাট অচেনা। বুনোর ঠিকানাটা খেয়াল আছে। পকেটে টাকাও আছে। ট্যাক্সি করলেই হয়ে যায়। পৌছে দেবে। ঝামেলা নেই। এই শহরে রাতে অনেক মানুষ চলাফেরা করে। ভয়ের কি?
আমি ট্যাক্সি করিনা। হাটতে থাকি। চুপচাপ। কোন কিছু না ভেবে কোন এক দিকে।
হাটতেই থাকি। যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাবো আজ আমি। অন্ধকার হবো।
ভালো লাগেনা। মাথার ভেতর রানা ভাইয়ের কথাটাই বেজে যাচ্ছে বারবার। যন্ত্রনা দিচ্ছে।
‘চাকরি নাই উনার। চাকরি নাই উনার। চাকরি নাই উনার। চাকরি নাই...।’
সত্যি?

৮.

ঘর গোছানোর তোড়জোর,

রাত নামে, আসেনা ভোর।

কুরবানির দিনেই সকালবেলা অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল গরুটা।

সে'কি বাজে অবস্থা। আগের রাতে জোর করে খাওয়ানো হয়েছে অনেক কিছু। তাতেই ডায়রিয়া। পেটও ফুলেছে। সকালে নামাজ পড়ে এসে দেখি নাই। বাবা টেনশনে। কুরবানি হবে কি দিয়ে? হাট ভেঙেছে। এই সময়ে গরু পাওয়ার উপায় নেই কোন।

ভাগ্য ভালো ছিলো সেদিন। গরু বিক্রি করতে না পেরে কাছের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক চাষা। তাকে ধরে কেনা হয়েছিল গরু। আমাদের বিপদ বুঝতে পেরে দাম হাকিয়েছিল অনেক। অনুনয় বিনয়ের পর মোটামোটি একটা দামে কিনেছি শেষে।

এরপর কসাই এনে কাটাকাটি, মাংস বাটোয়ারা, নানান কাজ। আমি এসবে নেই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। বাবাই খুশি মনে করেন সব। মাংস কাটাকাটিতে তিনি ওস্তাদ। কসাইকে বসিয়ে রেখে মাঝে মাঝে তিনি মাংস কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আমি নামাজ পড়ে এসেই বিছানায়। শুয়ে থাকি। বই পড়ি। রুবি এসে সালামি চায়। আমি ঝাড়ি দিয়ে ভাগাই। না শুনলে গোটা দুই কিল। রুবি মাকে গিয়ে নালিশ দেয়। মা এসময় রুহ আফজার শরবত বানান। সাথে ফিরনি, সেমাই আর লুচি। লোকজন যারা বাড়িতে আসে তাদের জন্য। আদুরে মেয়ের নালিশে মা হাসেন। গালে চুমু দিয়ে কড়কড়ে নতুন নোট দেন সালামি হিসেবে। সালামি আমিও পাই। শান্তির দিন। উৎসবের দিন।

সব কোরবানিতে এমন হয়না। এতসব খাওয়া দাওয়ার আয়োজন, মন ভালো থাকা! গত কোরবানীতে হয়েছিল। সুস্থ ছিলো মা। সচরাচর সুস্থ থাকেনা। মা সুস্থ থাকলেই আমাদের আনন্দ। মন ভালো সবার। আর অসুস্থ থাকলে মন খারাপ।

কেন এসব বলছি? এমন এলোমেলো কথা! কারণ আজ আমাদের মন খারাপ। আমি, রুবি আর মামা। মায়ের শরীরটা ভালো না। ডাক্তার বিশ্বজিত অপারেশনের আরেকটা চেষ্টা নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু জানাল মায়ের শরীর ভালো না। অপারেশনের ধকল সামলানোর মতন অবস্থা নেই। আমি আর রুবি মন খারাপ করে ছিলাম সারাদিন। মামা ছিলো হাসপাতালে। একটু আগে আসলো মামা। এখন আমাকে যেতে হবে।

আমার যেতে ইচ্ছে করেনা। মায়ের পাশে গিয়ে দাড়াতে ভালো লাগেনা। কষ্ট হয়। মায়ের মুখের দিকে তাকালে অসহায় লাগে। আমি রুবি আর মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বের হই। মামা বারবার করে বলে দেয়, রানা কিংবা রানার মতন আর কেউ তুলে নিতে চাইলে যেন না যাই। আগের দিনের ঘটনা বলেছি সবাইকে। মামা ঝাড়ি দিয়েছেন। বলেছেন, 'এত বড় হইছ, আক্কেল হইল না। কি দরকার ছিলো যাওয়ার?' বরাবরের মতন চুপ থেকেছি। ঝড়ের প্রথম ঝাপটা যাবার পর মামাকে বাবার কথাটা বলেছি। মামা সাথে সাথে ফোন দিয়েছিলেন বাবাকে। পাওয়া যায়নি। অই দিনের পর থেকে বাবাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছেনা। এটা নিয়েও টেনশনে আছি আমি আর মামা।

হাসপাতালের দিকে যাই। যেতে যেতে মায়ের কথা মনে পড়ে। মাথার ভেতর মাকে নিয়ে দারুণ সব স্মৃতি আসে আর যায়। মা আমার মনের কথা বুঝতে পারে মনে হয়। পৃথিবীর সকল মায়েদের সাথেই সন্তানদের টেলিপ্যাথিক কোন ব্যাপার স্যাপার আছে নিশ্চিত। এমন অনেক দিন হয়েছে যে খিচুরি খেতে ইচ্ছে করেছে হুট করেই। খিচুরি, ডিম ভাজা, শসা আর টমেটোর সালাদ। টিউশনি করে ফিরছি, ফেরার পথে ভাবনায় খিচুরির ছবি ভাসছে। যন্ত্রনা।

বাসায় আসলাম। এসে ব্যস্ত হয়ে গেলাম অন্য কাজে। ভুলেই গিয়েছি খিচুরির কথা।

রাতে খেতে বসে দেখি টেবিলে খিচুরি। মা প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন। সবকিছুই ঠিকঠাক মতন আছে। সাথে যোগ হয়েছে চাটনি। এমন একদিন না, অনেকবার হয়েছে। মা মনের কথা পড়ে ফেলেন। লুকাতে পারিনা কিছু।

ফজরের নামাজের পর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন মা। একদিন শীতের সময় গায়ের কাঁথাটা সরে গিয়েছিল। ঘুমানোর সময় স্থির থাকিনা আমি। খাটের এপাশ ওপাশ ছুটে বেড়াই। শীতের তীব্রতায় কাঁথা সরে যাবার বিষয়টা টের পেয়েছিলাম। আঁধো ঘুম, আঁধো জাগরন অবস্থা। আলসেমিতে ইচ্ছে করছিল না গায়ের কাঁথাটা টানার ঠিক এ সময়েই টের পেয়েছি মা গায়ে কাঁথাটা দিয়ে দিচ্ছেন কিংবা কোন এক ঝুম বৃষ্টির দুপুরে হয়ত জানালার পাশের সোফায় মাথা রেখে দিয়েছি ঘুম। উঠে টের পেয়েছি মা জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে যেন ভিজিয়ে না দেয় তার ছেলেকে। ঘুমের যেন এতটুকুনও ব্যাঘাত না হয়।

হাসপাতালে পৌছাই। রুগ্ন মানুষদের মুখ আর ভালো লাগেনা। চারিদিকে ঝামেলা।

আমার একটু একা থাকা দরকার। শূণ্যতা দরকার।

এই মিথ্যে শহরে অতিষ্ঠ লাগে। এত কষ্ট, অনিশ্চয়তা।

মনে হয় আমার এভাবে থাকার কথা ছিলোনা।

দোয়েল, ফিঙে, হালতি পাখি কিংবা গুবরে পোকার জীবন পাবার কথা ছিলো। শিউলি, বুনো ফুল ঘাস ডিঙিয়ে, পেছনে ফেলে কাঁচা রাস্তা আমার কোথাও যাবার কথা ছিলো। কচুরিপানার মতন অবুঝ হয়ে ভেসে ভেসে, রোদ-ছায়ায়, জলের ফেনায় আমিও নদীর খুব কাছের কেউ হতে পারতাম। কাঁদামাটি, গাছের বাকলে নাম লিখে কবি হবার সৌভাগ্য অর্জন করে একটু তাইরে নাইরে করলেও সালিশে খেয়ালি বলে আমাকে ক্ষমা করতো মজলিশ।

এমনই মনে হয়। প্রায়ই। চোখ যখন কোলাহল, তকদিরের কাছে মাথা নত করে কাজ করে যায় তখন মনে হয় এই আমার এখানে থাকার কথা ছিলোনা। কত কিছু হবার কথা ছিলো, ছুঁয়ে দেখার কথা ছিলো।
নষ্ট শহরে চায়ের কাপের ধোয়া না হয়ে বেঁচে থাকার স্বাদ পেতে পান্তার সাথে সালুন হতে চেয়েছিলাম। আমার হয়নি। হলোনা।
যাওয়া কথা ছিলো অরন্যে। হওয়ার কথা ছিলো সুতানালি সাপ, বুনো হনুমান, চিত্রা হরিন কিংবা ভেজা ঘড়িয়াল।
আমার এমন হলোনা। আছে শুধু শোক, অশ্রু, দুশ্চিন্তা।
এটাই জীবন আমার। মস্ত কারাগার। মুক্তি নেই। ক্লান্ত লাগে। একটু জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। পারিনা। সে সময় কই?
মায়ের সাথে দেখা হলোনা। ডাক্তার জানাল, দেখার মতন অবস্থায় নেই। সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে হবে।
সুরা পড়ি। সুরা ইয়াসিন। হাসপাতালের করিডরে বসেই মনে শান্তি আসে। প্রার্থনায় আরাম হয়। মন স্থির হয়।
হাসপাতালের বাইরের টেলিফোন বুথটা থেকে বাবাকে ফোন দেই। তিনি বাসায় আছেন এখন। অফিসে যাননা। জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, 'ঝামেলা। ঠিক হয়ে যাবে। অত বুঝে লাভ নেই।' খোলাসা করেননি কিছু। আমি, মামা ঘাটাইনি আর।
'বাবা, কেমন আছো? মায়ের শরীর ভালো না।' ওপাশ থেকে ফোন ধরলেই বলি আমি বাবাকে।
'ও। সেন্স আছে?' ভাঙা গলায় বলেন বাবা। শরীর ভালো না বোঝা যায়।
'শরীর খারাপ?' আমি চিন্তিত হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করি।
'জ্বর একটু। মায়ের কথা বল। ডাক্তার কি বলছে?'
'বলছে ভাগ্যের হাতে ছাড়তে।' আমি আস্তে করে বলি। কণ্ঠে শূন্যতা ভর করে।
'তোরা হাসপাতাল থেকে কেউ আজ নড়বিনা। ঠিক আছে।'
'আচ্ছা।'
'আমি ফোনের পাশেই আছি। বাসার টিএন্ডটি। আমার মোবাইল ফোনটায় সমস্যা। কিছু হইলেই কল দিবি।'
'ঠিক আছে।'
'দোআ কর মায়ের জন্য। আমি মসজিদে দোআর ব্যবস্থা করতেছি। সুযোগ পাইলে নামাজটা পড়িস।'
'পড়বো।'
'আর খাওয়া দাওয়া করিস। কিছু না খাইলে তুই আবার অসুস্থ হবি। অসুস্থ হইলে মা'রে দেখবি কেমনে?' বলে বাবা।
'বাবা রাখি। আচ্ছা বাবা তুমি কি ঠিক আছো?' কথা বলি আমি। ওপাশ থেকে বাবা জবাব দেয়না। আমিও চুপচাপ।
কিছুক্ষন চুপ থাকার পর বাবার ফোন রেখে দেওয়াটা টের পাই। আমিও ফোন রেখে টেলিফোন বুথ থেকে বের হই। মায়ের সাথে সাথে বাবার জন্যও মন খারাপ লাগে। কি ক্লান্তই না লোকটা!
অপুদা কলকাতায় এসেছে। কি ব্যবসার কাজ যেন। বুঝে গিয়েছে পড়াশোনায় হবেনা। গোপন এক ব্যবসা ধরেছে। আমাকে বলেছে এতটুকুই। বলেছে, 'বুঝলি, একবার জমলেই হইল। প্রোফিট আর প্রোফিট। এখনই কিছু বলা যাবেনা। সিক্রেট। ঠিক আছে?' আমি কাউকে বলিনি। তাছাড়া বললেও কি বলবো সেটা বুঝিনি।
অপু ভাইয়ের সাথে দেখা করি। ঠিকানা দিয়ে গেছেন। কোন কিছু না জানিয়ে চলে যাই। মাকে একা রেখে হাসপাতালে।
হাসপাতালের কাছেই আছেন তিনি। হেঁটে বিশ মিনিটের পথ। প্রচন্ড গরমে ঘেমে নেয়ে পৌছাই তার কোম্পানির অফিসে। অফিসে অপুদা ছাড়া কেউ নেই। সে মুখ শুকনো করে এবটা রুমে বসে আছে। রুমে টেবিল ফ্যান আছে কিন্তু চলছে না। বাইরের চেয়েও বেশি গরম এখানে। দোযখ গরম। সেখানেই এসে বসি। অপুদার পাশে।
'কি অবস্থা তোর।' পাশে বসে বলে অপুদা। ঘেমে গোসল লোকটা। দেখে বোঝা যায় ভালো নেই। কিন্তু কথা বলার সময় মুখে হাসি ঠিকই আছে।
'মায়ের শরীর ভালো না।' আমি বলি।
'তোর মামা আছে হাসপাতালে?'
'না।'
'তো? একা রেখে আসলি?'
'হ্যা।' আমি মাথা নিচু করে বলি। জানি অপরাধ করে ফেলেছি।
'আচ্ছা। সমস্যা নাই। চল, এই গরমে আর থাকা যাচ্ছেনা। বের হই। লেবুর শরবত মেরে দিয়ে আসি। আত্মা ঠান্ডা হয়।'
আমরা বের হই দুজনে। অপুদা হেড়ে গলায় গান ধরে, 'মুঝকো পানি পিলা দিজিয়ে।' মানুষটা কিভাবে পারে? জগতের সব ঝামেলা ভুলে এত শান্তিতে থাকতে! হিংসে হয়।
লেবুর শরবত খাই। খেতে খেতে অপু ভাই কথা বলে।
'ব্যবসাটা জমলো না। ধরা খেয়ে গেলাম।' হেসে হেসে বলে অপু ভাই।
'কেন? কি হলো?' কথাটা বলার সময় আমি চিন্তিত এমন একটা ভাব নেই।

‘দিলোনা। অন্য দেশের লোকদের সুযোগ দেবে না এরা। বহুত চালাক। বাদ দে।’
‘দিলাম বাদ।’ বলি আমি। ব্যবসার কথায় আনন্দ পাই না।
‘পনের দিনও টিকাইতে পারলাম না ব্যবসাটা রে। আমি একটা অপদার্থ। হা হা।’ আবারও ব্যবসা নিয়ে কথা শুরু হয়।
‘অপুদা তুমি টেনশন নিওনা।’
‘আরে আমার আবার টেনশন কি? একলা মানুষ। হা হা। বাপ-মায়ের ঠিক নাই। প্রোব্লেম হইলো এইখানে পড়াশোনাটা চালাইতে হইলে পয়সা লাগবো। অইটা ভাবছিলাম ব্যবসা দিয়া ম্যানেজ করবো। হইলো না। বাসা দিয়া পয়সা টয়সা দেয় না। জেদ কইরা আসছি ইন্ডিয়া। ধরা খাইয়া গেলাম। আবার দেশে ফিরতে হইবো। বাপ কথা শুনাবে। এই যা ঝামেলা। ব্যাপার না। বিন্দাস।’
‘তোমার মা-বাবার বিষয়টা জানতাম না।’
‘কতটুকুন জানিরে আমরা নিজেদের। হাসি খুশি মুখগুলা রাস্তাঘাটে যা দেখস সব মিথ্যা। কেউ শান্তিতে নাই। কেউ কাউরে শান্তিতে থাকতে দেয়না। আমরা লুকাই। সারাদিন চলে লুকোচুরি খেলা। হা হা।’
‘ও।’ বলি আমি।
‘তুই জানস না মনে হয়। মা-বাবা ডিভোর্সড। মায়ের আমারে নিয়া ভাবনা নাই। বাপেরও নাই। দুইজনই বিয়া কইরা নিজ নিজ লাইফ নিয়া বিজি। আমি পড়ছি চিপায়। আমি তাদের এক্সট্রা যন্ত্রনা। তাই অল্প কিছু টাকা চাইয়া কষ্ট কইরা আসলাম ইন্ডিয়া। পারলাম না। ধরা খাইয়া গেলাম। চল শিক খাই। কাবাব আর রুটির রোল। তারপর তোরে হাসপাতালে রাইখা আসি। তোর মাকে এতক্ষন একা রাখা ঠিক হবেনা। তোর তো মা আসে। মন খারাপ ক্যান ব্যাটা? আমার তো মাও নাই।’
‘চলো রোল খাই। রোল খেয়ে হাসপাতাল। পথে পথে তুমি গান গাবা কিন্তু অপুদা।’ আমি বলি। জীবনে এত দুঃখ পেতে নেই। জীবন এমনই। সহজভাবে নিতে হয়। আমি সহজ ভাবে নেবার চেষ্টা করবো। শুকরিয়া করুনাময়। আমার চেয়েও তো কত মানুষ কত কষ্টে আছে!
‘চল। চল। ওয়েহোয়ে। পানি পিলা দিজিয়ে। হা হা হা।’ অপুদা গান ধরে। তার পাগলামীতে চারপাশের লোকজন তাকায়। অপুদা থোড়াই কেয়ার করে। আমিও কেয়ার করিনা। পৃথিবীটা থাকার জন্য খারাপ জায়গা না এমনটা মনে হয়।
রোল খেতে খেতে হাসপাতালে পৌছাই। গিয়ে দেখি করিডরে মামা দাড়িয়ে। উদ্ভ্রান্তের মতন অবস্থা।
‘কই গেছিলি। তোর মা একলা না? থাবড়া খাবি।’ আমাকে দেখে চেচিয়ে উঠে বলে মামা।
‘মা ঠিক আছে মামা?’ আমার ভয় লাগে।
‘ঠিক আছে কিন্তু বুনো তো হারপিক খেয়ে বসে আছে। অবস্থা ক্রিটিকাল। বয়ফ্রেন্ডজনিত ঝামেলা। বয়ফ্রেন্ডটা টাউট বাটপার বলছিলাম না। কি ঝামেলা বলতো! দৌড়াদৌড়ি করে হাসপাতালে ভর্তি করেছি।’ বলে মামা।
আমি? এরপর আমার কি করা উচিত? বুনো কি বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। নইলে মামা এত সহজ করে বলতে পারতো না। কত মানুষইতো হারপিক খায় শুনি! সবাইতো মরেনা।
‘ইয়াক। ইয়াক। হারপিক একটা খাওয়ার জিনিষ হলো? বুনো মেয়েটা কি বোকা! চল চল খোঁজ নেই।’ অপু ভাই আমাকে ঠেলে ঠেলে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যায়। বুনোর কাছাকাছি।
বুনো মেয়েটাকে কি আমি ভালোবাসি? ভালো না বাসলেও বুনোর এই অবস্থায় তার জন্য কষ্ট পাওয়াটা কি দোষের কিছু?
মানুষ হলে তো পাওয়া উচিত। আমি মানুষ হতে চাই। খুব ভালো মানুষ।

৯.

অনেকখানি জ্বর,
দেখলো না কেউ, রইল পর।

আমরা বেআইনি ভাবে কোলকাতায় আছি।
সাইকেল চালিয়ে শিকারপুর যাওয়া পরিশ্রমের ব্যাপার। প্রায়ই যেতাম তবু। বন্ধুরা মিলে। নথুল্লাবাদ বাসস্ট্যান্ড পার হয়ে কাশিপুর থেকে সোজা শিকারপুর। ছোট্ট নদী। একটা আধটা নৌকা যায় কদাচিৎ। তাড়াহুড়ো নেই।
বন্ধুরা মিলে কোন একটা বাড়িতে হুট করে উঠতাম। সাথে আনা বাজার বাড়ির মহিলাকে দিয়ে বলতাম কিছু একটা রান্না করে দিতে। খুশি মনেই দিত গরীব মানুষগুলো। এই সুযোগে তাদেরও উপোস থাকা হতনা। ভালো মন্দ খাওয়া হত আমাদের সাথে।
বাজার সামান্যই। চাল, দেশি মোরগ আর আলু। মাঝে মাঝে বাড়ির লোক নদীতে খেচইন জাল দিয়ে তোলা ছোট চিংড়ি টেলে দিত। সাথে টক ডালের ভর্তা। এসব বোনাস। নদীতে ঝাপাঝাপি, গোসল শেষে খেতে বসতাম। ক্লাস শেষে সামান্য চড়ুইভাতি যেন!
একটু হাফ ছেড়ে বাঁচার জন্য, সামান্য কিন্তু অসামান্য স্বাদের কিছু খাবার জন্য একরকম জোর করেই নিয়ে আসতাম আমি বন্ধুদের। ওদের এসব ব্যাপারে আগ্রহ ছিলোনা। শহরে অনেকগুলো ভালো খাবারের দোকান আছে। বিশেষ করে সাউথ কিং রেস্টুরেন্টে চাইনিজ খাবারের ব্যবসা রমরমা। বন্ধুরা সবাই সেখানে যেত। আমার এসব দিকে আগ্রহ নেই।
বাবা একদিন নিয়ে গিয়েছিল আমাদের সবাইকে। মা সুস্থবোধ করছিলো। রুবি গো ধরেছিল চাইনিজ খাবে বলে। আমি বলেছিলাম, 'চাইনিজ খাবার মানেই তেলাপোকা, সাপ, ব্যাঙ সিদ্ধ। ইয়াক ইয়াক। খাবি তুই রুবি? রেস্টুরেন্টে না গিয়ে ঘরের একটা তেলাপোকা ধরে তোকে সিদ্ধ করে দেই কি বলিস?' রুবি বলেছিল, 'যাও যাও। আমি জানি চাইনিজ কি। বন্ধুর বাসায় খেয়েছি। ওদের বাসায় আনা হয়েছিল। অনেক মজা।' রুবিকে বোকা বানাতে পারিনি। পরিবারের সবাই মিলে চাইনিজ খাওয়া অই আমাদের প্রথম। রুবি শুরুতে এতটাই স্যুপ খেয়েছিল যে পরে আর অন্য কিছু খাওয়ার জন্য পেটে জায়গাই ছিলোনা। সে নিয়ে যা খেপিয়েছি ওকে তখন! চাইনিজ নেওয়া হয়েছে। রুবির প্রিয় চাইনিজ। আমরা যাচ্ছি কোলকাতা থেকে একটু দূরে পিকনিকের জন্য। বুনোর মা বলছিলো বোলপুরের কাছাকাছি কোথাও। সে'ও কম দূর না।
গ্রামের কাছাকাছি গেলে বুনোর ভালো লাগবে। ক্ষেত, চাষী, গ্রামের মানুষ, প্রকৃতি মন ভালো করে দেবে। ঠিক আছে সব। মেনে নিলাম মন ভালো হবে। কিন্তু চাইনিজ খাবারটা বেমানান লাগছে গ্রামের ভেতর। কিন্তু বুনোর মা বলল এটাই বুনোর ভালো লাগবে। আমাদের কিছু বলার নেই। মামা আমাকে আলাদা করে বলেছে,'কোন বাড়িতে আচমকা ঢুকে ডাল, তাজা মাছ আর ভাত মেরে দেবো। কি বলিস? দেবেনা খেতে? অতিথিপরায়ন হবে বলেই তো মনে হয়!' রুবি আবার খুব খুশি। তার চাইনিজ হলেই হল। বুনো তার জন্য চাইনিজের সাথে চকলেটও নিয়েছে। পোয়াবারো একদম রুবির।
হাসপাতালে অপুদা আছে। মামাকেও জোর করে পাঠিয়েছে। মামার আসার ইচ্ছা ছিলোনা। বোনের পাশে থাকতে চেয়েছিলেন। আমরা সবাই থাকতে চাইলেও ব্যাপারটা মনে হয় এখন নিয়মের মতন। কোন আন্তরিকতা নেই। যেন মায়ের ভাগ্যে কি আছে জানা সবারই। অযথা কালক্ষেপন। আমাদের কষ্ট দেওয়া। ভোগানো। মা'ই আসল অপরাধী!
ব্যাপারটা মা'ও মনে হয় টের পেয়েছেন। তিনিই বলেছেন শরীর ভালো তার। অপু থাকলেই হবে। না থাকলেও নাকি হবে। কেউ একজন থাকলেই তো আর অলৌলিকভাবে বেঁচে উঠবেন না তিনি! মৃত্যু তো লেখাই আছে কপালে। বরং আজকের দিনটা সবাই যাক। ঘুরে আসুক একটু। বিশ্রাম।

আমরা পৌছে যাই। দূরত্ব কম না। ট্যাক্সি ক্যাবের মিটার তরতরিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। এসেই খাওয়া দাওয়া। বুনোর মায়ের আদেশ। আসার পথে রুবি বমি করেছে দুই বার। ক্লান্ত সে। খাওয়া দাওয়ায় আর আগ্রহ দেখা যায়না তাই। চাইনিজ খাওয়া হয়। প্রিয় চাইনিজ মুখে তোলেনা রুবি। বিষয়টা প্রাসঙ্গিক না। তবুও মনে হয় ক্লান্ত হলে আমরা রুবির মতনই প্রিয় কিছু কিংবা প্রিয়জন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই।

'এই যে এইটা বিফ চিলি অনিয়ন, এটা মিট বল আর এটা হচ্ছে প্রণ...নাও, নাও..আহা, ওভাবে নয়তো এভাবে খেতে হয়... ।' আমাদের খাবার বেড়ে দিতে দিতে বলে বুনোর মা। তাকে মনে চাইনিজ খাবারের বিশেষজ্ঞ। কিভাবে চাইনিজ খাবার খেতে হয় সেটা আমাদের শেখানোই যেন তার আজকের প্রধান কাজ। তাছাড়া তিনি আমাদের দেশের লোকদের খুব একটা সভ্য মনে করেন বলে মনে হয়না। প্রথম দিন থেকেই আমরা তার অপছন্দের। বুনোর সাথে কথা বলার সময় শুনেছি তিনি আমাদের চোর বাটপার মনে করেন। আমাদের দেশে নাকি এমন লোক ঢের আছে। বিশ্বাস করা যায়না।

আমি বুনোর মাকে পছন্দ করিনা। তিনি আমাদের, আমাদের দেশের লোকদের হেয় করেন বলেই হয়তো। মহিলার চাইনিজ খাবার নিয়ে এত ছবক কেউ নিতে পারল না। মামা মেজাজ খারাপ করে বলেই ফেলল, 'আপনাদের দেশের এ কি চাইনিজ খাবার। বালি বালি লাগে। ধুর।' এরপর আর বুনোর মায়ের কথা শোনার অপেক্ষা না করে আধপেটা হয়েই উঠে গেল। দূরে গাছের আড়াল হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। রুবি একটু সুস্থ হয়ে ফড়িং ধরার কথা বলে দূরে চলে গেল। দূর বলতে চোখের আড়াল নয়। নদীর পাড় ধরে এক আধটু ছোটাছুটি। এখন সুস্থবোধ করছে সে। চাইনিজ খাবার ইচ্ছেও জেগেছে হয়ত। কিন্তু বুনোর মায়ের কথা শুনতে হবে বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। বুনোর মা আরাম করে খাওয়াতে পারল না আমাদের। ট্যাক্সিক্যাবওয়ালাকে নিয়েই ব্যস্ত হল অবশেষে। দেখি তার পাতে খাবার তুলে দিচ্ছে। লোকটা আয়েশ করে খাচ্ছে আর বুনোর মায়ের চাইনিজ খাবার নিয়ে আলাপ শুনছে। আমার মনে হল কথার চেয়ে তার খাবারের দিকেই মনযোগ বেশি। এই প্রথম আমার বুনোর মায়ের জন্য খারাপ লাগল। মনে হল মহিলা খুব একা। খুব একা।

বুনো সুস্থ। শারীরিক দিক থেকে। মানসিক দিক থেকে সুস্থতা আসেনি এখনও বোঝা যায়। পেট ওয়াশ করে আজেবাজে যা ছিলো সব বের করা হয়েছে। ডাক্তার রেস্ট এ থাকতে বলেছে। বুনো শোনেনি। জেদি মেয়ে। একে আটকে রাখা যায়না। একরকম জোর করেই হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় এসে উঠেছে। কারো সাথে কোন কথা নেই। চুপচাপ।

আমি বুনোর আচরণে অবাক হচ্ছি। বুনোকে এমন মেয়ে মনে হয়নি কখনও যে ভালোবাসার সম্পর্কে কষ্ট পেয়ে ভেঙে পড়বে। শক্ত, সমর্থ, আত্মবিশ্বাসীই মনে হয়েছিল মেয়েটাকে। এমন কি হয়েছে যে মরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে? এত সহজ তো নয় সবকিছু। চাইলেই হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দেওয়া যায়না। বুনোকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। আমি উটকো লোক। জিজ্ঞেস করাটা আমার মানায় না।

সবাই এদিক ওদিক ছড়ানো। বুনো কখন আমার পাশে এসে দাড়িয়েছে টের পাইনি। সে এসেই একটা শীতলপাটি বিছিয়ে দেয়। তারপর ইশারায় আমাকে বসতে বলে। বুনো মুখ চোখ ফুলে আছে। একা হলেই কাঁদে হয়ত। আমি বুনোর কথামতন পাটিতে বসি। সে বসে পাশে। গ্রামের মিষ্টি হাওয়া বয়ে যায়। মেঘের মতন সরে সরে যায় লুকোচুরি রোদ। মিষ্টি লাগে।

'আমার এমন করা উচিত হয়নি। তাই না?' দূরে নদীর পাড়ের দিয়ে তাকিয়ে বলে বুনো।

'এ প্রশ্নের উত্তর যে জানিনা।' বোকার মতন বলি আমি। বুনো কি জানতে চায় আমার কাছে বুঝে উঠতে পারিনা।

'তুমি কি আমার কাছ থেকে এমন আশা করছিলে? এই যে আমার মতন কনফিডেন্ট একটা মেয়ে। তার কাছে?'

'না।' সত্যটাই বলি। আমার জবাব শুনে বুনো তাকায় আমার দিকে।

'সত্যি বলেছ দেখে ভালো লাগছে। জানো, আমাদের ভেতর থেকে না সত্যিটাই উধাও হয়ে গেছে। আমরা কেউ আর সত্যি বলিনা। বলতে পারিনা। মিথ্যে একটা জীবন আমাদের। অসহ্য।'

'ঠিক।' কথার সাথে তাল মেলাই।

'একটা কথা বলি?'

'অনেকগুলো বল।' হেসে দেই আমি।

'মেয়েরা যতই আত্মবিশ্বাসী কিংবা সফল হোক না কেন রিলেশন নিয়ে খুব সেনসিটিভ। মন ভাঙলে ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক। তবে হ্যা, আমার মরে যাওয়ার চেষ্টা করাটা ঠিক হয়নি। একটা গাড়লের জন্য মরে যাওয়ার কোন মানে হয়না।'

'কি হয়েছিল?' আমি আস্তে করে বলি। ভয়ে ভয়ে বলি।

'আমার একটু একটু তৈরি করা স্বপ্নগুলোকে এক মুহূর্তে শেষ করে দিয়েছে গাড়লটা। ভবিষ্যতের কথা বলে গাড়লটা স্কলারশিপ নিয়ে দেশ ছাড়ছে এখন। ভাবলনা আমার কথা একবারও। আমি তো ভেবেছি। কখনও ভাবিনি ভবিষ্যতটা আমার একার। ভেবেছি দুজনার। হুট করেই না জানিয়ে চলে যাওয়া। ছি!'

'দূরে থাকলে কি ভালোবাসা ফুরিয়ে যায়?'

‘যায়। খুব যায়। এমন গাড়লরা লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ রাখতে পারেনা। আমি তো জানি কিভাবে লড়াই টিকিয়ে রেখেছিলাম সম্পর্কটা। কেন যে রেখেছিলাম। সব দায়িত্ব যেন আমারই। ও শুধু শরীর পেলেই ঠান্ডা।’ এই বলে চোখ বন্ধ করে বুনো। চোখ হতে গড়িয়ে পড়ে দু-ফোটা জল।
‘থেমে থাকবে জীবন?’ আমি আর ঘাটাতে চাইনা। আবেগে আবেগে এখন হয়তো অনেক কিছু বলে ফেলবে বুনো। ভেতরের সবকিছু। বাজে যা। সেসব হয়তো শুনতে ভালো লাগবেনা।
‘তা কেন? লাইফ গোজ অন এবং অনেক সতর্ক হয়ে এগোতে হবে আমাকে এবার।’ কথাগুলো বলার সময় বুনো চোয়াল শক্ত করে। জেদ যেন!
‘শুভকামনা তোমার জন্য।’ বলি আমি।
‘আচ্ছা, তোমাদের ঝামেলা গেল। ও তো বিদেশে এখন। সন্দীপ মুখার্জির কাছে যেতে হলে আবার চিনবে কিনা কে জানে! ওরই পরিচিত ছিলো।’ কথা অন্য দিকে যায়।
‘না। কিভাবে যাবে? বাবা চেষ্টা করছেন। লাভ হচ্ছেনা। কোলকাতায় বেআইনি ভাবেই আছি বলা যায়। পুলিশ জানলে পাসপোর্ট নিয়ে নেবে। আটকও করবে হয়তো।’
‘টেনশন কোরোনা। ঠিক হয়ে যাবে।’
আমি কথা শুনে হেসে দেই। যেই মেয়ে কয়েকদিন আগে মরে যাবার চেষ্টা করেছে সে আমাকে টেনশন করতে নিষেধ করছে। আমার হাসির কারন জানতে চায়না বুনো। সে দৌড়ে নদীর দিকে ছুটে যায়। তারপর রুবির সাথে ছোঁয়াছুয়ি খেলতে থাকে। কি দারুণ দৃশ্য!
মামা আসে। তার হাতে সিগারেট। সিগারেট নিয়ে আমার সামনে খুব একটা আসেনা। সিগারেট হাতের মধ্যেই জ্বলেছে কিছুক্ষন বোঝা যায়। কোন কারণে হয়ত টানার সময় পায়নি। ছাই জমে আছে। ভেঙেচুরে পড়ছেও না। সিগারেটের শরীর আকড়ে ধরে আছে ফুরিয়ে যাবার আগে।
‘অপু কল দিছিলো।’ মামা বলেন আমাকে। শুকনো কণ্ঠ।
‘কি বলে? ঠিক আছে মা’র শরীর।’ বলি আমি।
‘ঠিক আছে। কিন্তু ঝামেলা অন্য জায়গায়। ভীষন ঝামেলা। পুলিশ এসেছে তালতলা থানা থেকে। সাদা পোশাকে মনে হয়। অপু সব খোলাসা করে বলতে পারল না। ভয় পেয়েছে। যা বললো তাতে বুঝলাম হাসপাতাল কতৃপক্ষকে পুলিশ বলেছে আমরা বেআইনী ভাবে আছি। পাসপোর্ট আটক করা হবে। এতটুক বলে পুলিশ চলে গেছে। ঝামেলা ছিলোনা। টাকা পয়সা খাওয়ায়ে কিছু একটা করতে পারতাম। সমস্য হইলো এই ঘটনার পর তোর মাকে আর হাসপাতালে রাখতে চাচ্ছেনা হাসপাতালের লোকজন। অপু বললো, তোর মাকে হাসপাতাল ছাড়া করা হবে। তোকে আর আমাকে খুঁজছে। আমাদের বলবে তোর মাকে নিয়ে যেতে। অপুর কাছে শুনলাম তাদের ব্যবহারও ঠিক নাই।’
‘আচ্ছা।’ একসাথে অনেক কথা বলে মামা। ধীর স্থির ভাবে। স্বাভাবিকই মনে হয়। চোখে শুধু একটু টেনশন আছে এই যা! আমরা আসলে পাথর হয়ে যাচ্ছি। বিপদ আপদ আজকাল অবাক করে না। গায়ে লাগে না। বিপদ আসলে আবার চলেও যাবে। কিংবা না গেলেই বা কি!
আমাদের কোন তাড়া নেই। মাকে চিন্তা করিনা। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি আমি আর মামা। মেঘের অদবদল হয় আকাশে। সূর্য পড়ে যায়। ছায়াশীতল। ভালো লাগে। মামার হাতে সিগারেটটা পুড়তে থাকে। তিনি টান দিতে ভুলে যান। ছ্যাৎ করে যখন হাতে তখনই টের পাবে হয়ত। আপাতত থাকুক। নদী দেখি। আকাশ দেখি। গ্রাম দেখি।
কোলকাতা পড়ে থাকুক পেছনে। বিপদ পড়ে থাকুক পেছনে। কষ্ট পড়ে থাকুক পেছনে।
পড়ে থাকুক। ভীষনভাবে।

১০.

ভালোবাসায়, আশায়,
সুর আসে, কেটে যায়।

কতটা জোরে চিৎকার করে বলা যায়, 'ভালোবাসি'?
বাবার বান্ধবী এসেছে কোলকাতায়। মা তাকে সহ্যই করতে পারেনা। না পারার অনেক কারন। এই মহিলা দেখতে সুন্দর। পিএইচডি না কি সব করেছেন। আমার মা সাধারন সুন্দর। পড়াশোনা অনেক ধকলের পর বি এ পাশ। মা সামনাসামনি মহিলার সাথে খুব মিষ্টি করে কথা বলে আর আড়ালে গেলেই 'সর্বনাশী' বলে সম্বোধন করে। বলে, 'সর্বনাশী নিজেই সংসার করতে পারেনাই। আমার সংসারটাও ধ্বংস করতে চায়।' মহিলাকে আমার খারাপ মনে হয়নি কখনও। বরং দেখে একটু মায়াই হয়েছে। মনে হয় অনেক দুঃখ তার। নিজের আত্মবিশ্বাস, উচ্চশিক্ষা এবং অর্থ দিয়ে সে দুঃখ ঢেকে রাখেন তিনি। তাতে লাভ হয়না। তার চোখের বিষাদ ধরা পড়ে ঠিক ঠিক।
নি:সন্তান মহিলা। বিয়ের কিছুদিন পরেই স্বামী সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যায়। দোষ তার পড়েছে। উচ্চশিক্ষিত বলে বদনামের পরিমাণটা কিছু বেশি হয়েছে। সমাজ এখনও হয়ত নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা এসব বিষয় নিয়ে কিছুটা বিব্রত এবং বিভ্রান্ত। ওপর ওপর বোঝা যায়না, কেউ স্বীকার করতে নারাজ কিন্তু ভেতরে অবস্থা এমনই।
মহিলা বাবার ভালো বন্ধু। একসাথে পড়াশোনা করেছে। পড়াশোনা শেষে অনেকদিন যোগাযোগ ছিলোনা। হুট করেই বাবার অফিসে দেখা। কোন একটা কাজের জন্য এসেছিলেন। পড়াশোনা শেষে শিক্ষকতা করছেন তিনি। সফল বলা চলে।
মায়ের সন্দেহপ্রবন মন। মা সামনাসামনি ভালো ব্যবহার করলেও পেছনে গেলেই নিন্দা শুরু করে। তার আমাদের আদর করাটা সহ্য, আমাদের জন্য টুকিটাকি গিফট্ নিয়ে আসাটা পছন্দ হয়না।
মৃত্যুশয্যায় থেকেও মা মহিলাকে নিয়ে খারাপ কিছু বলার সুযোগ ছাড়েনা। মেয়েরা তাদের স্বামী, সংসার নিয়ে এতটা স্বার্থপর হয় যে অবাক লাগে। কিংবা এটা হয়ত অন্য কিছু। ভালোবাসার অন্ধকার দিক কোন।
'কিছু খাবে?' বাবার বান্ধবী বলে। আমি ওনার সাথে বের হয়েছি। দারুণ সময় কাটে। কোলকাতা শহরটা ঢু মারার ইচ্ছা ওনার। মায়ের কঠোর নিষেধ স্বত্বেও বের হবার লোভ সামলাতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন যেন একশত হাত দূরে থাকি আর রুবির দেখা যেন না পায়। মায়ের কথা সবসময় শুনতে হয়না। আমি তাই শুনিনি।
'পানিপুরি খাওয়া যায়।' আমি বলি। ওনার কাছে কিছু চাইতে কেন জানি লজ্জা লাগেনা। সহজ হওয়া যায় অল্প সময়ের ভেতরেই। কিছু চাইলে, প্রয়োজন হলে বলা যায়। মনে হয় উনি সব পারেন, ওনাকে সব বলা যায়।
'শুধু পানিপুরি? তরতাজা একটা তরুণ এত কম খেলে হবে?' উনি মুচকি হেসে বলেন। কি সুন্দর পরিমিত হাসি!
'পানিপুরিতেই চলবে।' আমি বলি।
'আজ পুরো শহরটা ঘুরে শহরটাকে পুরনো করে ফেলব বুঝলে? ট্রাম এ চড়বো। কোলকাতার সব খাবার টেস্ট করবো। ফূর্তি।'
'মায়ের কাছে যেতে হবে যে। টেনশন হয়।'
'চলে যাবে যে তাকে কি আটকে রাখতে পারবে? কি দরকার তাকে নিয়ে ভেবে নিজের সময় নষ্ট করবার।'

‘জ্বি।’ আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মাথা নিচু করে কথাটা বলি। এই বইয়ের মতন গোছানো কথা ভালো লাগেনা। আমার মাকে, জীবনকে কোন যুক্তি দিয়ে বাঁধতে চাইনা। আমার জীবনের সবচেয়ে জরুরী মা। মাকে নিয়ে কোন হেলাফেলা, কোন পরীক্ষা, সূত্রে আমি যেতে রাজি নই।

এরপর আমার আর ঘুরে বেড়ানোতে মন বসেনা। খাওয়ার দোকানে যাওয়া হয়। কোলকাতার সেরা বিরিয়ানিও বিস্বাদ লাগে। বাবার বান্ধবীর চোখে আমার বিষাদ ধরা পড়েনা। সে আনন্দ নিয়ে ঘোরে। ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরা হয় শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। লেকের পানিতে বোটে ভাসা হয়। পাখির ভিড় চোখে পড়ে। মহিলা আমাকে নানা পাখি চেনায়। হালতি, রাজহংস, খোঁপাডুবুরি দেখি। সে বলে, ‘জানো জানো এটা খোঁপাডুবুরি পাখি। কি সুন্দর না? কাছাকাছি যেতেই ডুবসাঁতারে হারাল আবার দূরে গিয়ে মাথা ভাসাল। মাথা কালো মাথা আর কালচে কানঝুঁটিটা পাগল করে দেয়। আই লাভ ন্যাচার। প্রকৃতি আমাদের বড় করে...।’

তিনি বলেই যান। কথা এক প্রসঙ্গ থেকে ঘুরে ঘুরে অন্য প্রসঙ্গে যেতে দেরি হয়না। তার এই জ্ঞানের কথাগুলো আজ আর ভালো লাগেনা। মাকে নিয়ে তার কথাটা নিতে পারছিনা।

আমি সূত্র মেলাই। মায়ের মতন এই মহিলাকে সর্বনাশী কিভাবে, কেন বলা যায় সে চেষ্টা করতে থাকি। তার এখানে আসার কারন কী? পিএইচডি? মাকে একবারও দেখতে গেলনা কেন উনি? দোষ ত্রুটি বের করার কঠিন চেষ্টা।

এরপর বিকেল শেষে সন্ধের দোরগোড়ায় আসে যখন সময় তখন তিনি আমাকে নামিয়ে দেন হাসপাতালের কাছে। নিজে ওপরে যাননা। বিদায় নিয়ে চলে যান যে হোটেলে উঠেছেন সেখানে। বলেন, কাল আবার বের হবেন। আমার মাথা ধরেছে। চোখ জ্বলছে। আমি কথার জবাবে মুচকি হাসি। তিনি সম্মতি মনে করে আনন্দ নিয়ে চলে যান। আমি রাস্তায় কিছুক্ষণ দাড়িয়ে হাসপাতালের ভেতর ঢুকি। মাথা ঘোরায়। প্রেশারের সমস্যা হয়ত। এত অল্প বয়সে এ রোগ তো হবার কথা না!

হাসপাতালের ভেতরে এসিতে শীত লাগে। এসির ফ্রেয়নে আমার এলার্জি। বুনোর সাথে দেখা হয়। সে অফিস শুরু করেছে। পড়াশোনাও হচ্ছে। বাজে সব কিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করছে। কাজে থাকলেই এটা সম্ভব। বুনোর হাসি মুখ দেখে বোঝা যায় সে সামলে নিয়েছে নিজেকে অনেকটাই।

‘আমি সন্দীপ মুখার্জির সাথে কথা বলেছি।’ আমাকে দেখে ডেস্ক থেকে উঠে এসে বলে বুনো।

‘কি বললো?’ এই এতক্ষনে যেন আমার একটু ভালো লাগে। দম নিতে পারি।

‘বললো বিষয়টা আপাতত থামানো গেল কিন্তু ঝামেলা হবে পরে। লোকটা ভালোই। কয়েক জায়গায় ফোন দিয়ে ভাগালো পুলিশ। পাসপোর্ট আটকে ফেলার আগেই একটা কিছু করতে হবে নইলে সবাইকে পড়তে হবে বিপদে। উনি যেতে বলেছে একদিন। এই সপ্তাহেই।’ বলে বুনো।

‘যাবোতো। আচ্ছা, মা কেমন আছে?’ বলি আমি। আমার খুব ভালো লাগে এই মুহূর্তে বুনোর সাথে কথা বলতে। নিশ্চিন্ত লাগে।

‘আমি দেখে এসেছি একটু আগে। দেখে আসো। আর শোন, তোমার দেশ থেকে ফোন এসেছিল। হাসপাতালের নাম্বারে কেন দিলো বুঝলাম না। তখন ছিলাম না আমি। কলিগ বললো। আবার কল দেবে নাকি। দেখা করে এদিকেই এসো।’

‘আচ্ছা।’ কথাটা বলে আমি মায়ের কেবিনের দিকে হাটা দেই।

কে কল দেবে? বাবা মনে হয়। আবার কোন খারাপ সংবাদ। এ নিয়েই তো আছি। সমস্যা নেই। সমস্যা মনে হয়না আর।

তবে হ্যা বাবার হাসপাতালের নাম্বারে কল দেবার কথা না। অন্য কেউ হবে হয়তো। কিন্তু দেশ থেকে আমাকে আর কে’ই বা ফোন দেবে!

চাইলেই দুশ্চিন্তা করা যায়। কিন্তু করিনা। দুশ্চিন্তায় ঘেন্না ধরে গেছে। কি হয়? কিছু হয়না চিন্তা করে। বরং থেমে থাকাই ভালো।

মায়ের কেবিনে ঢুকে দেখি ঘুমাচ্ছে। ইদানীং খুব ঘুমায় আমার মা। ধকল যায় খুব তাই বিশ্রাম। সারাদিন কত শত ওষুধ গেলা, শরীর চিড়ে সুচ ঢোকানো! বেঁচে থাকার চেষ্টা সহজ না। এর চাইতে মৃত্যু অনেক সহজ মনে হয়!

মায়ের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে। অনেকক্ষন ধরে গল্প। মা-ছেলের আড্ডা দেওয়া। মায়ের বকা খেতে ইচ্ছে করে। আজ এখনই খুব করে ইচ্ছে করে। এইসব ইচ্ছেরা লাগামছাড়া। কেন আসে, যায় ঠাওর করা যায়না।

আমি কারণ খোঁজার চেষ্টা করি। বাবার বান্ধবী কি? মাকে হারানোর ভয়? মায়ের জায়গায় আমি কাউকে যে কল্পনাও করতে পারিনা। জীর্ণ, শীর্ণ, রোগা মা’ই ভালো আমার।

মায়ের ঘুম ভাঙাই না। মা ঘুমায়। তাকে ভালো করে দেখি। চোখের নিচে যে কালি পড়ে তারই একটা প্রলেপ যেন এখন সারা মুখে। গায়ের রং মলিন, মৃত। কিন্তু একটা মায়া আছে। পবিত্রতা আছে। প্রার্থনার মতন। ধর্মের মতন। দেখলেই শান্তি হয়। মনে হয় এটাই পৃথিবী। যে পৃথিবী টিকে থাকার জন্য লড়াই করছে প্রতিদিন।

মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। তার নিঃশ্বাস নেওয়া দেখি। বেঁচে আছে এটা জেনে আশ্বস্ত হওয়া। মায়ের হাতটা ধরতে ইচ্ছে করে। ঘুম ভেঙে যেতে পারে এই ভয়ে সাহস হয়না। পাঁচ-দশ -পনের মিনিট পর বের হতে হয়। রোগীর কাছে বেশিক্ষন থাকায় নিষেধ আছে। যাই আবার বুনোর কাছে। বুনো কাজ করে আর আমি পাশে বসে থাকি। কাজ করা দেখি। মানুষের আসা যাওয়া দেখি। সব চিন্তা বাদ দিয়ে এভাবে মানুষ দেখতে ভালো লাগে। তাদের ব্যস্ততা, ছোটাছুটি ভালো লাগে।

‘ফোন। বাংলাদেশ থেকে।’ বুনোর এক কলিগ ফোন ধরে চিৎকার করে জানায়।
আমি বিরক্ত হই। মানুষ দেখায় ডুবে গিয়েছিলাম। এর মাঝে এই ছেদ ভালো লাগেনা। বাবার সাথে পরেও তো কথা বলা যাবে। কি এমন কথা আছে আর এই পৃথিবীতে। অন্তত আমারতো আর বলার কিছু নেই।
ফোন ধরি। ‘হ্যালো হ্যালো’ বলি অনেকবার। কেউ কিছু বলেনা। বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দেবার ঠিক আগ আগেই শুনি বলছে একজন ‘হ্যালো।’
বুঝি। বুঝি যাই আমি কে। বিশ্বাস করতে পারিনা। বিশ্বাস হয়না। কিভাবে সম্ভব! আমি কি এর জন্যেই অপেক্ষায় ছিলাম আজ, এতগুলো দিন।
‘আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি ভালো আছেন?’ মাহবুবা বলে। কি বিনীত, নম্র, শান্ত জলের মতন বয়ে যাওয়া কণ্ঠ।
‘ওয়ালাইকুম আসসালাম। এইতো চলছে। সবাই কেমন আছে? হোমওয়ার্ক? ঠিকঠাক?’ বলি। নিজের অবাকপনা লুকোতে ইচ্ছে করে। পারিনা।
‘দেশে আসেন।’
‘আসবো তো।’ আমার ভালো লাগে। এই কথা বলতে ভালো লাগে।
‘তাড়াতাড়ি।’
‘আচ্ছা তাড়াতাড়ি।’ বলি আমি। এরপর আর কথা হয়না। কিংবা কথা হয়। কথা বলি আমরা। চুপচাপ থেকেই বলে দেওয়া যায় অনেক কিছু। বোঝানো যায় অনেক কথা। এভাবে দু-প্রান্তে দুজন। চুপচাপ কত কথা। আমাকে কি কেউ দেখছে এভাবে? বুনো? দেখুক। কি আসে যায়!
লাইন কেটে যায়। টাকা শেষ হয়তো। আমি তাও ফোন কানে দিয়ে দাড়িয়ে থাকি। ঐ প্রান্তে মাহবুবা এখনও দাড়িয়ে নিশ্চিত।
আমার চলে যাওয়া ঠিক হবেনা। মাহবুবাকে ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে।
আমি কি পাগলামি করছি? এসব কি? কেন? কি বলা যায় একে? আমি এর নাম দেবো কি?
চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে ‘ভালোবাসা’। নাম দিলাম ভালোবাসা।
ঠিক আছে?

১১.

আলো নেই, রাত নিঝুম,
বুজলেই চোখ, আসে ঘুম।

বুনোর মা আমাদের ঘর ছাড়তে বলেছেন।
আদেশ নয় ঠিক, অনুরোধ। বুনোর কারণে আদেশের সাহস হয়নি। মামার সাথে কথা বলেছেন। হাত ধরে বলেছেন,‘সমাজে থাকি। বাইরের দেশের মানুষ ভাড়া দেওয়াটা আশপাশের মানুষের পছন্দ না। নিরাপদ না। রাগ করবেন না। বাসাটা ছাড়েন।’ মামা কিছু

বলেনি। আমরা তো আর খুব বেশিদিন থাকবোনা। মামা সপ্তাহ দুই সময় চায় কিন্তু বুনোর মা মানতে রাজি নয়। আমরা তো চিরদিন থাকবো না। মা সুস্থ হলেই চলে যাবো কিংবা মা...থাক। কে চায় নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও দিন কাটাতে। আমি অন্তত না। বুনোর মায়ের রাগের কারন কিছুটা আঁচ করতে পারি। বুনোর সাথে আমার মেলামেশা পছন্দ করছেন না। সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তার কাছে দূরের কেউ। দোষ দেইনা। মেয়ের মায়েরা এমনই হয়।

আমি বুনোকে নিয়ে চিন্তিত। বুনোকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু মেয়েটা পিছু ছাড়তে চায়না। দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ও। যত দুর্বল হচ্ছে আমি তত আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি। ধরা ছোয়ার বাইরে কিংবা পাওয়া কঠিন এমন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে। আমার কাছে বুনোকে এখন সহজলভ্য মনে হচ্ছে। বুনো কোন একটা ঝামেলায় আছে। যন্ত্রনায় আছে। ওর নিচে কাকের পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় যে যন্ত্রনায় ওকে জেগে থাকতে হয়। বুনো বলছে না কারনটা। আমি জানতে পারছিনা।

'এই মহিলা কি চায়? এই বয়সে টকটকে গাড় লিপস্টিক দিয়ে ঘুরে।' মামা বলে কানের পাশ থেকে। তার মেজাজ খারাপ। বুনোর মায়ের কথা সে নিতে পারেনি। টাকা পয়সা তো ঠিকই দেওয়া হচ্ছে। সে মানুষ খারাপ তাওতো না। তাহলে এই বাড়িতে থাকতে কি সমস্যা! মামা আর এ বাড়িতে থাকবে না। যত দ্রুত সম্ভব হোটেলে উঠবেন। খরচ বেশি হোক তবুও উঠবেন।

মেজাজ খারাপ মামার কোন কিছুই সহ্য হচ্ছেনা এ মুহূর্তে। বাবার বান্ধবী খুঁজে খুঁজে চলে এসেছে বুনোর বাসায়। তার উপস্থিতি সহস্য করা যাচ্ছেনা। এমনকি আমারও ভালো লাগছেনা। একসময়ের পছন্দের মহিলাটি এমন অপছন্দের হয়ে উঠলো কিভাবে কে জানে!

রুবি তার সামনে বসে আছে। কোল ভর্তি চকলেট। চকলেট নিয়েও খুব একটা খুশি মনে হচ্ছেনা রুবিকে। কারন মহিলা বকবক করেই যাচ্ছে। নানান প্রশ্ন করছে পড়াশোনা নিয়ে।

'পরীক্ষা তো দিতে পারো নাই রুবি। তাইনা?' বলে মহিলা।

'হ্যা।' মুখ শুকনা করে বলে রুবি। চোখ তার চকলেটের দিকে।

'এভাবে তো বাচ্চাদের পড়াশোনা হয়না। বারো মাসই অসুস্থ তোমার মা। প্রব্লেম। তা বই খাতা নিয়ে এসেছো সব সাথে?'

'হ্যা।'

'পড়াশোনা করো বলে তো মনে হয়না। তোমার দিকে কারো কোন খেয়াল নাই। আমি খেয়াল রাখবো। ওকে?'

রুবি জবাব দেয়না এবার। বুনো চলে আসে রুবির কাছে। ছাদে যাবে। রুবির বয়সী আরও কিছু ছেলে মেয়েরা আসবে। এই সময়টা রুবির জন্য আনন্দের। পৃথিবী জুড়ে রুবির বয়সী ছেলে মেয়েদের চিন্তা-ভাবনা, ব্যবহার, খেলাধূলা সব মনে হয় একই রকম। ভিনদেশের ছেলে মেয়েগুলোর সাথে রুবি খুব সহজেই মিলে যায়। ঝগড়া করে, খাবার ভাগ করে খায়, খেলতে খেলতে সময় ভুলে যায়।

রুবিকে নিতে আসার ব্যাপারটা পছন্দ হয়না বাবার বান্ধবীর। সেটা জানিয়ে দিতেই যেন বুনোকে দেখেই সে আপন মনে বলে, 'বুনো-এ আবার কেমন নাম? এই নাম কেন? আজগুবি।'

'বনে থাকত তো ছোটবেলায় তাই নাম বুনো।' বুনোর হয়ে রুবিই জবাব দেয়। খিলখিল করে হাসে। মহিলাকে আচ্ছাসে শিক্ষা দেওয়া গেল এইজন্য যেন। বুনো আর রুবিকে দুই প্রানের বান্ধবী মনে হয় এই সময়ে দেখে। একজন আরেকজনের সামান্যতম সন্মান ক্ষুন্ন হতেও দেবেনা যেন। কোন একজনের কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করলেই তার বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত সাপের মতন ফুঁসে উঠবে যেন।

দুইজনকে এভাবে দেখে বাবার বান্ধবী আর কথা বলবার সাহস পায়না। বুনো চলে যায় রুবিকে নিয়ে। এরপর বাবার বান্ধবী একা বসে থাকে। কথা বলার কেউ নেই। আমি আর মামা দূরে আড়াল থেকে সব দেখি। কাছে যাইনা। কাছে গেলেই কথা বলতে হবে। এই মহিলার সাথে কথা বলার এখন কোন মানেই হয়না।

'শোন্ আমি গেলাম হাসপাতালে। তুই থাক। কথা বল।' মামা আমাকে বলে। কি সুবিধাবাদী! মহিলার কাছে আমাকে রেখে নিজে উধাও হবেন।

'না না। থাকো তুমি। আমাকে যেতে হবে। তাছাড়া মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।' এই বলে চোখটা ছলছল করে তোলার চেষ্টা করি আমি। মুখে ছদ্মবেশী বিষাদ মেখে শুকনো মুখে মামার দিকে তাকাই। মাকে দেখতে না পারলে মরেই যাবো যেন এমন একটা ভাব!

ভাগনে ভাগনির মলিন মুখ মামা সহ্য করতে পারেন না। বলে,'আচ্ছা যা যা। বুঝছি। থাকতে হবেনা। সব ঝামেলা আমার।' আহারে বেচারা মামা। আমার হাসিই পায়। মা অই মহিলার সাথে কথা বলার জন্য শুকনো মুখে যান। ভদ্রতা বলেও তো ব্যাপার আছে।

আমি পালাই। মহিলার সামনে পড়তে চাইনা। তাকে আমার এখন আর ভালো লাগেনা। সে কি চায়? একবারও দেখা করলো মায়ের সাথে! আমাদের সাথে কি? মতলব ভালো না মহিলার। সহ্য হয়না। সহ্য হচ্ছেনা একটুও আমার।

বাইরে বের হই। যতই দূরে হোক হাসপাতাল পর্যন্ত হেঁটে যাবো বলে ঠিক করি।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। বিভ্রান্ত। দেখি।
মেঘগুলো কোন দিকে যাবে মন স্থির করতে পারেনা। কেউ কেউ সাহস করে একটু যেন পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করে। ভালো লাগে। তবে আমার বাড়ির মতন নয়। আপন ভিলার ওপরে চুপটি করে থাকা এক টুকরো মেঘের মতন নয়।
একটা সময় ইচ্ছে ছিলো পৃথিবী চষে বেড়াব। আমি কোন একটি শহরের নয়, কোন একটি দেশের নয়। আমি পুরো পৃথিবীর। পৃথিবীর সব সাগর, নদী, পাহাড় আমার। ঘুরে ঘুরে সেসব জায়গা ছুঁয়ে দিতে চাই। এক জায়গার মেঘ থেকে আরেক জায়গার মেঘে কোন বেসকম আছে কিনা জানতে চাই।
এমনই চাইতাম। কত সুন্দর পৃথিবী আর আমি এর কিছুই দেখব না এ কেমন কথা!
পরে ঘরকুনো হয়ে গেলাম। মধ্যবিত্তের ছেলেদের এমন হয়। তারা ঘরের বাইরে বের হতে ভয় পায়। বিদেশ তাদের কাছে অনেক দূর, ভয়ের আর অজানার। জানা গন্ডির মধ্যেই থাকতে চায় তারা। তুচ্ছ জিনিষের প্রেমে পড়ে। নিজের ঘর, নিজের বাড়ি এইসব অনেক জরুরী বিষয় হয়ে ওঠে।
আমার ক্ষেত্রেও তাই। যখন বুঝে গেছি পুরো পৃথিবীর হয়ে ওঠার যোগ্য আমি নই তখন থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। আপন ভিলাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অই আমার রাজ্য। আমার ছোট্ট জায়গা।
ইচ্ছেগুলো আমাদের অচিন পাখিই হয়ে থাকে। ধরাছোয়ার বাইরে থাকে। একটা সময় ভুলেও যাই সব। তারপর যখন হুট করে মনে পড়ে যায় তখন মন উচাটন হয়। ঘর ছাড়তে ইচ্ছে করে। স্বার্থপর হয়ে শুধু নিজের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে।
নিজের কথা ভাবলেই স্বার্থপর বলে কেন? নিজের কথা ভাবা কি দোষের কিছু?
হাসপাতালে যাইনা। আমি হাটতে হাটতে অপু ভাইয়ের অফিসের দিকে যাই। হাসপাতালের কাছেই।
অফিসে তালা ঝোলে। ব্যবসায় মার খেয়ে ভাড়া দেবার ক্ষমতাও নেই। অপু ভাই অফিসের কাছে চায়ের দোকানে চুপ করে বসে থাকেন। মনমরা থাকেন। কিন্তু মন খারাপ কেন জিজ্ঞেস করলেই বলে,'ধুর ব্যাটা, আমার মনই কি আর সেই মনের আবার খারাপ হওয়া কি! মনটন নিয়া ভাবলে চলেনা। বসে বসে ভাবি। চা খাই আর ভাবি কি করা যায়। বোঝা গেছে?'
এই লোককে ভালো না বেসে উপায় নেই।
গিয়ে ঠিক ঠিক চায়ের দোকানে পেয়ে যাই অপু ভাইকে। মন ভালো হয়ে যায়। কিছুটা সময় টেনশন ছাড়া ফুরফুরে মেজাজে থাকা যাবে। অপু ভাইয়ের কথা শুনবো আর হাসবো। আমাকে দেখে অপু ভাই বলে, 'ভাবনায় ডিস্টার্ব করতে আসলি রে। চা খাবি।'
'দাও।' আমি খুশি মনে মাথা নাড়াই।
'তোর মায়ের কি অবস্থা?' চায়ের ঘটি আমার হাতে দিয়ে বলে অপু ভাই।
'উন্নতি নাই। একইরকম।' আমি বলি।
'উপরওয়ালারে ডাক। এছাড়া গতি নাই। ডাক্তার ফাক্তার কিছু করতে পারবেনা।'
'হুম।'
'হুম টুম না। ধর্মে মন দিতে হবে। আমিও ঠিক করছি সব বাদ দিয়া ভালো হয়ে যাবো।'
'ভালো হইলেও ভালো।' আমি চা খাওয়ায় ব্যস্ত। চা টা খুবই ভালো হয়েছে আজ। দুধের সর ভাসছে ওপরে।
'কি কথাবার্তা তোর। কোন রককষ নাই। ঠিকমতন জবাবও দিতে শিখলি না।'
'বলো বলো। চা খাই তো।'
'আচ্ছা খা। শাকচুন্নিটার খবর কিরে?'
'শাকচুন্নি কে আবার? অবাক হয়ে বলি আমি।
'তোর বাবার বান্ধবী। আবার কে।'
'মামার কাছে রেখে আসছি।' এই কথা বলার সাথে সাথেই দুজনে সজোরে হেসে উঠি। ঘটির চা ছলকায়।
'আহারে মামা রে। কাজটা ঠিক করিস নাই।'
'আর কোন উপায় ছিলোনা। আপনি বাঁচলে মামার নাম।' আবারও হাসি আমরা। চা খাওয়া শেষ করি।
'বুনোর কি অবস্থা?' অপু ভাইয়ের কণ্ঠস্বর বদলায়। সিরিয়াস অনেক।
'ভালোই তো।' আমি বলি। এড়িয়ে যাবার জন্য। অপু ভাই কি জানতে চায় আমি জানিনা।
'দায়সারা জবাব দিসনা।'
'কি জানতে চাও?'
'আমি যেটা জানতে চাই তুই সেটা ভালো করেই জানিস। জবাব দেবার দরকারই নাই থাক। শুধু বলবো, তোদের বিষয়টা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারছি আমি। অন্য একটা দেশে এখন তুই। মায়ের চিকিৎসা করতে এসে এমন কিছু করিস না যাতে সবার ক্ষতি হয়। সাবধান করে দিলাম।'

আমি কিছু বলিনা। অপু ভাই আরেক কাপ চা খাবো কিনা জানতে চায়। আমি 'না' বলি। তারপর হুট করেই অপু ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নেই। অপু ভাই অবাক হয়না। আমি এমন করবো এটা যেন জানাই তার। সে শুধু বলে সবার খেয়াল রাখতে আর একটু ফ্রি হলে হাসপাতালে যাবে এটাও জানায়।
আমি চলে আসি। হাসপাতালেই যাবো। অন্য কোথাও না। কিন্তু মায়ের সাথে দেখা করবো না আজ।
হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে চুপচাপ বসে থাকবো। যতক্ষন বসে থাকা যায়।
সবকিছু জটিল করে ফেলেছি। আমিই দায়ী? জট পাকিয়েছে। কিভাবে ছুটবে জানিনা।
আমার এসব আর ভালো লাগেনা। ইচ্ছেগুলো আবার জীবিত হয়ে উঠতে চায়। সব ছেড়েছুড়ে পৃথিবী দেখতে ইচ্ছে করে। সাগর, নদীর বুকে ঝাপিয়ে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে। অচেনা জায়গায় গিয়ে বাস করতে ইচ্ছে করে। নতুন মানুষ, নতুন জীবন।
এসব হবেনা। মধ্যবিত্তের ছেলেদের ভালো থাকার ওষুধ একটাই। সেটা ভুলে থাকা।
ভুলে থাকলেই ভালো থাকা যায়।
আমি ভুলবো। ইশ, যদি বুনো আমার মতন ভুলে যেতে পারত!
অপরাধ করে ফেলেছি। ভয়ংকর অপরাধ।
বুনো ক্ষমা করবে না। কখনও করবেনা।
আমি ভুলতে চেয়ে পথ ভুল করি। হাসপাতালে যাওয়া হয়না। কই যাই? কই যাই?
এমন কেন হয় আমার সাথে সবসময়?
পথ চিনিনা। চেনা নাই।

১২.

নিজেকে পোড়াই রোজ,
পুড়িয়ে ফুরিয়ে হচ্ছি নিখোঁজ।

সাপে ভয় আমার।
মাহবুবার বাড়ির পাশে স্বর্ণলতা গাছ। রোদে সোনার মতন জ্বলে। মাঝে মাঝে এক টুকরো রোদের ঢিবি মনে হয়।
'স্বর্ণলতা দিয়ে নেকলেস হয়না? গলায় ঝুলবে?' আমাকে প্রশ্ন করে মাহবুবা। স্বচ্ছ চোখ তার। সেখানে নীল সাগর আর আকাশ লেপটে যায়।
''হয়তো। অত কথা বাড়াতে হবে না। আঁকো স্বর্ণলতা। ওয়াটার কালার না। অয়েল পেইন্টিং।' আমি বলি। নীল সাগর আর আকাশে মুগ্ধতায় নিখোঁজ হতে হতে।
'জল রং। আমি ওয়াটার কালারই করবো। এই রং দুষ্ট। পানিতে পড়লেই কথা শোনেনা। ওদের নিয়ে থাকতে ভালো লাগে।'

‘আচ্ছা আচ্ছা করো। কথাই বলবে নাকি আঁকবে কিছু। স্বর্ণলতার ঝোপ, পাশে বাড়ি, বাড়ির জানালায় ধরা পড়া আকাশ। আঁকোনা।’ এই বলে আমি চায়েতে সল্টেজ বিস্কুট ডুবাই। এসময় রাস্তায় কোন একটা রিকশার ঘন্টির আওয়াজ শুনি। একটা পাখি ডাকে। নেড়ি কুকুরটা কুই কুই করে কোন একদিকে ছুটে যায়।

‘জানেন আমার জানালা লাগোয়া হাস্নাহেনা গাছের তীব্র গন্ধে ঘরে সাপ আসে।’ বলে মাহবুবা হাসে। আঁকায় মন নেই তার। সে শুধু এক রং এর সাথে তুলি দিয়ে আরেক রং মেলাচ্ছে। খুব একটা কথা বলেনা এই মেয়ে। তবে মাঝে মাঝে আগল খোলে। আড়াল হতে বের হয়ে আসে। তখন কারো কথা না শুনে খুব বকে।

মাহবুবার ঘরের পাশে হাস্নাহেনা গাছ নেই। হাস্নাহেনা আর সাপের গল্প সে কেন করছে জানিনা। আমি সাপের ভয় পাচ্ছি। হাস্নাহেনা গাছ নেই জেনেও ভয় করছে। সাপে আমার গা রি রি করে। ভয়ের চেয়ে ঘেন্না লাগে বেশি। সোফায় পা উঠিয়ে বসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চুপ থাকি। মাহবুবার সামনে নিজেকে ভীতু প্রমানিত করা ঠিক হবেনা। একদম।

‘আঁকো।’ ধমকে বলি আমি। চায়ে চুমুক দেই।

‘এঁকেছি। এই যে।’ বলে মাহবুবা। তারপর জোরে হাসতে থাকে। আমি তার আঁকা ছবির দিকে তাকাই। দেখি সাপ এঁকেছে। ভয়ংকর এক সাপ। এখনই ফনা তুলবে এমন। জলজ্যান্ত সাপ যেন। আমার ভয় লাগে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে।

ঠিক এই সময়েই আমার ঘুম ভাঙে। এটা স্বপ্ন ছিলো। কেন এমন স্বপ্ন দেখলাম আমি?

স্বপ্নটার কিছু কিছু অংশ সত্যি। মাহবুবার সাথে কথোপকথনের দু-একটা বাক্য একদম ঠিকঠাক। পুরনো ঘটনাই কিছুটা নতুন করে দেখলাম। রিকল করা বলে একে। কিন্তু রিকল করবার সময় কিছু কিছু নতুন বিষয় ঢুকে গেছে স্বপ্নে। যেমন সাপ আঁকার বিষয়টা। আমার কঠিন করে ভাবতে ইচ্ছে করেনা। আমি গোয়েন্দা, বিজ্ঞানী কিংবা মনোবিশারদ নই। সামান্য মানুষ তাই সহজ করে ভাবতে ইচ্ছে করে। লজিকে চলিনা। চলতে চাইও না।

বুনো ঘুম ভাঙায় আমার। সারা শরীর ঘামে ভেজা। আমি বুনোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। সামনে দাড়িয়ে থাকা, কথা বলা মানুষটা যে বুনো সেটা বুঝতে একটু সময় লাগে।

‘দুঃস্বপ্ন?’ বলে বুনো।

‘হ্যা।’ আমি ঢোক গিলে বলি। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

‘চা খাও। ভালো লাগবে।’ এই বলে বিছানার পাশে চা রেখে সে চলে যায়।

আমি চা খাই। চুপচাপ। তারপর খাওয়া শেষে শূন্য চায়ের কাপ হাতে নিয়েই বারান্দায় গিয়ে দাড়াই। আজ মানুষ মেরে ফেলা রোদ। পুড়ে যাবার মতন অবস্থা। শরীরের যেখানেই রোদ এসে ছোঁয় সেখানেই ছ্যাৎ করে লাগে।

‘হাসপাতালে যাবেনা?’ বুনোর গলা শুনে পেছনে ফিরে তাকাই।

‘যাবো তো। তোমার কি হয়েছে বলবে?’ বলি আমি। বুনো আমার কাছ থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে নেয়।

‘না। বলবো না।’ বলে বুনো। চোখ শূন্য চায়ের কাপে। সে ভালো নেই দেখেই বোঝা যায়।

বুনো কিছু বলতে না চাইলে জোরাজুরি করা ঠিক হবেনা। অন্য কথা বলি।

‘জানো তো চলে যেতে বলা হয়েছে। তোমার মা বলেছে। চলে যাবো আমরা। মামা বাড়ি খুঁজছে। কিছু ম্যাইৎ করা না গেলে হোটেলেই উঠে যাবো।’

‘যাও। ওটাই ভালো হবে মনে হয়। সবার জন্য ভালো।’ বলে বুনো।

আমি অবাক হই। ভেবেছিলাম বুনো প্রতিবাদ করবে। অন্য কোথাও যেতে চাচ্ছিলাম না। একটা ক্ষীন আশা ছিলো যে বুনো তার মায়ের সাথে কথা বলে সব ঠিক করে ফেলবে।

‘আমার ওপর রাগ করে আছো?’ আমি বলি।

‘তা কেন? আচ্ছা থাকো। কাজ আছে আমার। শোন, তোমার পাসপোর্ট নিয়ে ঝামেলাটা মেটানো দরকার। গতকাল কথা হয়েছে মামার সাথে। আমি আর উনি মিলে সন্দীপ মুখার্জির সাথে দেখা করবো। বিষয়টার সুরাহা না হলে দেশে যাওয়া নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে পারো।’ বলে বুনো। রোবটের মতন। বলার জন্য বলা যেন।

‘আচ্ছা।’ আমি বলি। অভিমান হয়। এই এত কিছু যে হয়েছে, হচ্ছে সেটার কিছুই আমাকে বলেনি মামা। আর বুনোও মাত্র বলল। জিকে জরুরী মনে হচ্ছেনা। কোন কিছুর সমাধান আমার কাছে নেই কিংবা আমাকে দিয়ে কোন সমাধান হবেনা বলেই হয়ত এভাবে বলা।

‘আর ভালো খবর আছে একটা। আকাশ লোকটাকে পাওয়া গেছে। সন্দীপ মুখার্জির ওখান থেকে জানালো। এই লোক ঘাঘু অনেক। এমন ধাপ্পাবাজি আরও দিয়েছে। তাকে খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি সন্দীপ মুখার্জির জন্য।’

‘টাকাটা পাওয়া যাবে?’

‘না মনে হয়। মামা তো তাই বললো। তার সাথেই কথা হয়েছে।’ বলে বুনো।

‘ও।’ টাকাটা পাওয়া যাবেনা শুনে আমি আর আকাশ নামের লোকটার প্রতি আর কোন আগ্রহ বোধ করিনা। শুরুতে ছিলো। মনে হয়েছিল সামনে পেলে খুন করে ফেলবো। চাচ্ছিলাম কোন একদিন দেখা হয়ে যাক অথবা আমি নিজেই ঠিক খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করবো যে কেন আমাদের সাথে এমন করলো? সে আগ্রহ এখন আর নেই। কোন একটা ব্যাপারে দীর্ঘসময় নিয়ে বসে ইচ্ছে করেনা এখন আর। মনে হয় যেতে দেই চারপাশটাকে। নিজের জীবনকে। আমি নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে জট পাকাবে সব। তার চেয়ে চলুক প্রকৃতির নিয়মে। ইচ্ছেমতন ভাঙুক, গড়ুক, কাঁদুক, হাসুক যা ইচ্ছে তাই। সেভাবেই ভালো।
বুনো চলে যায়। আমি বারান্দায় থাকি। পাশের ঘর থেকে বুনো আর রুবির কথা শুনি। এই দুইজনের জমেছে খুব।
রোদ একটু একটু কমে। ছায়া হয়ে গলে পড়তে চায়। হাওয়া আসে। গরম হাওয়া। ভ্যাপসা।
স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর পাতলা হাফ হাতা শার্টটা পরে বের হই। বাইরে কোথাও থেকে খেয়ে নেব পরোটা আর চাটনির সাথে দু-টুকরো কাঠবাদাম। কোঠারি হাসপাতালের নিচেও খাওয়া যায়। ফ্রুট স্যান্ডউইচ। দাম বেশি পড়বেনা। হাতের টাকা-পয়সা শেষ হয়ে আসছে। বাবা মামার কাছে যা পাঠায় সেখান থেকে চাইতে খারাপ। মায়ের চিকিৎসার টাকায় আমি বিলাসিতা করে বেড়াবো সে হয়না।
বাবার সাথে কথা হয় ফোনে। হাসপাতালে মায়ের কেবিনের দিকে যাবার খুব আগেই। অনেকদিন পর বাবার সাথে কথা। আজকাল সে আমার সাথে আলাদা করে কথা বলেন না। প্রয়োজনীয় যা কথা মামার সাথেই। টাকা পয়সার ব্যাপারে। দায়িত্ব পালন যেন।
বাবা জানায় সে ব্যবসা শুরু করেছে। এর মধ্যে ঢাকা গিয়েছিল। স্টক লটের বিজনেস। একজন কিছু টাকা দিয়েছে। ওটা দিয়েই ব্যবসা হচ্ছে। কিছু একটা করতে হবে তো। বাবাকে অনেক উৎফুল্ল মনে হয়। নতুন জীবন শুরু করেছে এমন।
সে তার বান্ধবীর কথা জিজ্ঞেস করে। কেমন আছে এই মহিলা, রুবি তাকে পছন্দ করে কিনা, আমার কেমন লাগে এইসব। মায়ের কথা তার মুখে শুনিনা। মাকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় ভুগতে দেখিনা। কথা শেষ হয় তাড়াতাড়ি। বাবা ব্যস্ত আছেন বলে ফোন রেখে দেয়।
আমি এরপর মায়ের ঘরে যাই। বাবার ফোনের কথাগুলো ভুলে যাবার চেষ্টা করি। সে ভালো আছেন এটাই তো বড় কথা। কোন একটা উপলক্ষ হলেও তাকে ভালো রাখতে পারছে এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে! ছোট নই। বুঝি। টের পাই। যা হচ্ছে এটাই মনে হয় স্বাভাবিক। তবুও মন সায় দেয়না।
মায়ের ঘরে যাই। শরীর ভালো নেই একদম তার। আহারে মা আমার। আহারে মা।
‘রুবি কেমন আছে?’ বলে মা। কথা স্পষ্ট না। ঘরঘর আওয়াজ। নাক দিয়ে কি সব টিউব দেওয়া। রাইস টিউব দিয়েও খেতে হয়েছে কয়েক দিন। মায়ের রোগটা আসলে কি ডাক্তার কি আদৌ জানে? মনে হয় না।
‘ভালো আছে। কথা বলার দরকার নাই। ঘুমাও।’ আমি বলি।
‘সারাদিন তো ঘুমাই। তোর বাবা কেমন আছে রে। লোকটা আমার জন্য নিজের জীবনটা শেষ করলো।’ বলে মা। তার কথা বলতে কষ্ট হয়। তবুও বলে। মানুষ কথা না বলে থাকতেই পারেনা।
‘ভালো আছে। সবাই ভালো আছে মা।’ কথা বলতে গিয়ে আমার গলা কেন জানি ভারি হয়ে আসে। মায়ের পাশে ছোট্ট একটা বাচ্চার মতন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মাকে বলতে ইচ্ছে করে, ‘মা আর ভালো লাগেনা। তোমার ছেলে পারছে না। ক্লান্ত। ক্লান্ত ।’ বলা হয়না। নার্স তাড়া দেয়। যেতে হবে। পাশে আরো রোগী আছে। কথায় তাদের সমস্যা হয়।
‘অপারেশনটা হবে?’ মা বলে। চোখে ভয়। অপারেশনের জন্য ভয়।
‘হবে। টাইম আর ডেট আজ জানাবে ডাক্তার।’
‘রুবিকে দেখে রাখিস। আমার পুতুল মেয়ে। আমিতো দেখে রাখতে পারলাম না।’ কথা বলার সময় মায়ের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে।
‘কি শুরু করছো। সুস্থ হয়ে যাবা। থাকো। গেলাম আমি।’
‘মাহবুবা ভালো আছে? ছবি আঁকা শিখতো যে।’ মা বলে। মাহবুবার কথা কেন বলে? এখনই কেন বলে? মায়েরা কি সব বুঝতে পারে?
‘হুম। সবাই ভালো আছে। ঘুমাও তো। যাই।’ কথাটা বলে বের হই। নার্স আমার ওপর বিরক্ত বোঝা যায়।
আমি মায়ের ডাক্তারের সাথে দেখা করতে যাই। আজ জানানো হবে কখন, কবে অপারেশন হবে মায়ের। মামা সকালেই গিয়েছে ডাক্তার বিশ্বজিৎ এর ওখানে। এই লোকের দেখা পাওয়া মুশকিল।
যেতে যেতে মায়ের কথাটা মাথায় ঘোরে। বাবা তার জন্য জীবনটা শেষ করেছে। কোন একজনের জন্য কি জীবন শেষ করে দেওয়া যায়? কাছের একজনের জন্য? আমাকে যদি কারো জন্য জীবন শেষ করতে হয় সেটা কে হবে? মাহবুবা নাকি বুনো? বুনো নাকি মাহবুবা? ঘুরপাক খায় এ দুটো নাম। বারবার।
চেম্বারের বাইরে যেতেই মামার সাথে দেখা হয়। সে নো স্মোকিং জোনে দাড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে হাসপাতালের ভেতরে। কি ভয়ানক ব্যাপার। বিশ্রি ব্যাপার। কেউ কি টের পায়নি বিষয়টা? দেখে ফেললে কেলেংকারি হয়ে যাবে। শাস্তি, জরিমানা।

‘তোর মায়ের অপারেশন কাল। দুপুরে। শরীর ভালো না। রিস্ক নিতে হবে। কালকেই অপারেশন।’ সিগারেট টানতে টানতে আমার সামনেই বলে মামা। তারপর বুড়ো খোকার মতন ফ্যাচ করে কেঁদে দেয়। বোনের জন্য। আমি মামাকে জড়িয়ে ধরি।
আমি কাঁদি বা কেঁদেছি কিনা সেটা আজ জানাতে ইচ্ছে করছে না।
ছেলেদের কান্না দুর্বলতার পরিচয়। নিজের সে পরিচয় সবার সামনে আনতে ভালো লাগেনা।
শুধু চাই মা ভালো থাকুক। বেঁচে থাকুক। মাকে আমার সুস্থ দেখতে ইচ্ছে করে।
ও মা। মা আমার।
শুনতে পাও তোমার ছেলের ডাক। শুনতে পাও?

১৩.

তারকাটায় জড়ানো পাখি,
দিচ্ছে ফাঁকি, দিচ্ছে ফাঁকি।

ডুবে গেছে কোলকাতা।
বৃষ্টি হয়েছে সারারাত। টুপটাপ, ঝুমঝুম বৃষ্টি।
ডুবে গিয়েছিলাম আমিও। বাড়ির সামনের পুকুরটায়। খেলতে খেলতে। বাটার নতুন জুতোটা কাদার মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল আর ভেসে উঠল না। সে’কি কান্না। আমি ভেসে উঠেছিলাম। পেট ভর্তি পানি। বমি টমি করে একশেষ।
শোক আমার জুতোর জন্য। মা বলেছিল কিনে দেবে একটা। ঝা চকচকে বাটার নতুন বেল্টের জুতো। আমি জানতাম দেবেনা। দিলেও শর্ত জুড়ে দেবে সাথে। ক্লাসে প্রথম পাঁচ জনের ভেতর থাকতে হবে, অঙ্কে নব্বই এর ওপর পেতে হবে এসব।
অনেক আগের কথা। সে যাত্রায় ডুবে যাওয়া থেকে বেঁচে যাওয়া আমি কোলকাতার রাস্তায় ভিজতে ভিজতে ভাবছি এসব।
সন্দীপ মুখার্জির গাড়ি আসে। আমি গাড়িতে উঠি। তিনি আমার হাতে তার পায়ের নতুন জুতোটা ধরিয়ে দেন।
তিনি ধনী মানুষ। বাটার জুতো তার পড়ার কথা না। বাটা মধ্যবিত্তের জুতো। এই জুতোর প্রতি মধ্যবিত্তের এক ধরনের মোহ কাজ করে। ডিজাইন যাই হোকনা কেন টেকে বেশিদিন। লং লাস্টিং বিষয়টাই মধ্যবিত্তের জন্য সবচেয়ে জরুরী।
‘মার ডালো। শালে...।’ বলে সন্দীপ মুখার্জি।
আকাশ নামের লোকটা সামনে বসা। হাত, পা দড়ি দিয়ে বাধা। ইতোমধ্যেই মারধোর তাকে করা হয়েছে এটা বোঝা যায়। শরীরে রক্তে ভেজা। আমার দেখে ঘেন্না লাগে। বমি আসে। ভেতর থেকে নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসতে চায়।
হাতে ধরা বাটার জুতো। সন্দীপ মুখার্জি এই জুতো দিয়ে আকাশকে মারতে বলছেন। আমি পারছিনা। এই লোকের প্রতি আমার এখন আর কোন আগ্রহ নেই। সে টাকা পয়সা সব নিয়ে মায়ের চিকিৎসা প্রায় থামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু থেমে থাকেনি। মায়ের অপারেশন আজ। রাতে হবে। বার ঘন্টার মেজর অপারেশন। বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। চিকিৎসক নিজেই সাহস দিতে পারছেনা। তাদের মুখ শুকনো।

মায়ের জন্যই এসেছি এই দূরদেশে। মা বাঁচবে এই আশায়। সে না বাঁচলে আর রাগ, ক্ষোভ পুষে লাভ কি। আমার আর আকাশ লোকটার ওপর কোন রাগ নেই। আমি বাটার জুতো সন্দীপ মুখার্জির দিকে এগিয়ে দেই। বলি, 'পরে নিন।' তারপর আকাশ লোকটার হাতের বাঁধন খুলি। সন্দীপ মুখার্জির লোকজন আমাকে থামানোর চেষ্টা করতেই সন্দীপ মুখার্জি চোখের ইশারায় তাদের থামতে বলেন। আমি কি করি সেটা হয়ত তিনি দেখতে চান। বাটার জুতো আবার পায়ে গলিয়ে তিনি আমাকে দেখতে থাকেন। আমি আকাশ লোকটার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে গাড়ি থামাতে বলি। গাড়ি থামে। তাকে বলি চলে যেতে আর বলা হয়, 'পারলে আমার মায়ের জন্য একটু দোআ করবেন। প্লিজ। তার দোআ খুবই দরকার।' আকাশ লোকটা মাথা ওপর নিচ করে জানায় দোআ করবে। সে নড়েনা। দাড়িয়ে থাকে রাস্তার ওপর। পায়ে শিকড় গজিয়েছে যেন।

আকাশ লোকটা যাচ্ছেনা দেখে সন্দীপ মুখার্জি ধমক দিয়ে বলে, 'ভাগ শালা নইলে এত্ত গুলি করবো যে গুলির খোসা বেঁচে বড়লোক হয়ে যাবি।' ধমক শুনে আকাশ লোকটা দৌড়ায়। অনিচ্ছার দৌড়।

গাড়ি চলতে থাকে। চলতে চলতে পৌছায় পাসপোর্ট অফিসে। সন্দীপ মুখার্জি আমাকে নিয়ে যান এক বড় কর্মকর্তার ঘরে। আমাদের নিয়ে কথা হয় তার সাথে। মায়ের অসুস্থতার কথা বলা হয়। আমি তখন দুখী দুখী মুখ নিয়ে দাড়িয়ে থাকি। যদি করুণা হয় এই আশায়। সমস্যাটা থেকে বের হওয়া দরকার।

বড় কর্মকর্তা আমার উপস্থিতি পছন্দ করেন না। সন্দীপ মুখার্জি এটা বুঝে আমাকে চোখের ইশারায় বাইরে যেতে বলেন। আমি এতেই খুশি হই। একটানা দুখী মুখ বানানোর অভিনয় আমাকে দিয়ে হয়না।

রুমের বাইরে চুপ করে বসে থাকি। কানে কথা আসে স্পষ্ট। বড় কর্তা বেশিরভাগই অন্য আলাপ করেন। সন্দীপ মুখার্জির ব্যবসা নিয়ে কথা। টাকা পয়সা নিয়ে কথা। আমাদের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। সন্দীপ মুখার্জিকে বলেন, অযথা জড়াচ্ছেন কেন? কি স্বার্থ? সবশেষে সল্যুশন। সীমান্তে লোকের অভাব নেই সন্দীপ মুখার্জির। বলেন বেআইনী ভাবে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যেতে। পাসপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়। দেশে যাওয়ার একমাত্র উপায় বনগাঁ পার হয়ে ওপারে যাওয়া। মুরগির মতন গাদাগাদি করে মাল নেবার ট্রাকে উঠতে হবে। তারপর একটা পথ টানা রিকশা কিংবা অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে। কিছু উঁচু নিচু টিলা আছে। সেখানে দালালরা থাকে। সীমান্ত রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে কাটাতারের বেড়া পার হতে হয়। ঘুষ লাগে কিছু। সেটা তেমন কিছুনা। আমি বাইরে বসে সব শুনি। সব। আফসোস হয়। নিজেকে নিয়ে আর নিজেদের সমস্যা নিয়ে আফসোস। কোন সমাধান হলোনা। অসুস্থ মাকে নিয়ে কিভাবে অই বাজে পথ দিয়ে দেশে ঢুকবো?

সন্দীপ মুখার্জি আর বড় কর্তা কথা বলতে থাকেন। বাইরে বসে আমার শরীরটা ভালো লাগেনা। পিঠের দিকটায় কেমন একটা অচেনা চিনচিনে ব্যাথা। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে লাগে। শীত। কাঁপুনি ধরে। জানালার বাইরে অল্প একটু আকাশ। তার ঠিক নিচেই চৌকো দালান সব। সিমেন্ট, ইট, রঙ, তারপিন আর রডের স্তুপ। সবুজ কই? আছে দুই একটা গাছ। শো-পিসের মতন সাজানো। রাস্তার মোড়ে, বারান্দায়, ঠায় দাড়িয়ে। ঠিক মানানসই না। মানুষের পৃথিবীতে মানিয়ে নিতে গাছগুলো হিমশিম খাচ্ছে বোঝা যায়। গরম বাতাস। জ্বর শরীরে নিঃশ্বাসের উত্তাপ যেন। সমস্ত পৃথিবীটাকে থার্মেমিটার দিয়ে মেঁপে দেখা দরকার। তারপর মায়ের জলপট্টি। ওতে জ্বর নামবে। দিনভর পানি দেওয়া। তাপ পালাবেই। চিন্তারা এমন হয়। কই থেকে কই যায়। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারিনা। নবীজির জীবন কাহিনী পড়তে দেখি মাকে। বিষাদ সিন্ধু পড়তে পড়তে চোখের পানি ফেলেন। মা ফাতিমার জন্য সে'কি কষ্ট। মধ্যবিত্ত মা আমার। সব ভাবনা আজ ঘুরে ফিরে মায়ের কাছে এসে শেষ হয়। ইলিশ মাছের ডিম, ডাটা, কলমি শাক, জলপাই আচারের তেল, ঘন ডাল-আমার মায়ের রান্না। ঘ্রাণ পাই। বন্ধ চোখে অনেক কিছু দেখা যায়। এগুলো আর কখনও পাবোনা। আমার মাকে পাবোনা নাকি পাবো? আজ অপারেশনের পর তিনি কি সুস্থ হবেন? ছেলের কপালে হাত রেখে বলবেন, 'শরীর তো পুড়ে যাচ্ছে তোর। দাড়া মাথায় পানি দিতে হবে। খালি অনিয়ম করিস। আমি আর পারিনা। তোরা আমাকে শান্তি দিবিনা?' আমি মুচকি মুচকি হাসবো। এর মানে হলো মাকে শান্তি দিতে রাজি নই। সুবোধ ছেলে হবার মজা কই?

একটু বেয়ারা, দুষ্ট হলেই মায়ের আদর পাবো। মা সারারাত জাগবেন। নিজের খাওয়া দাওয়া ঠিক নেই কিন্তু খাওয়া নিয়ে আমাকে বকবেন। ওষুধ খেতে ভুলে যাবেন। এর মধ্যে রুবি কিছু একটা ভাঙবেই। কাঁচের জিনিষ। এই মেয়ের হাতে কিছু থাকেনা। মা কতবার মেজাজ খারাপ করে বলেছেন সব স্টীলের হবে। জগ থেকে প্লেট, গ্লাস সব। রুবির প্লেটটা অবশ্য মেলামাইনের। কাঁচ টিকবেই না তার কাছে। বাবা কয়েকবার বকা খাবেন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বকা খাওয়া লোক একটা। মায়ের বকা খেলে কেন জানি মনে হয় খুশিই হন। বকা খেতে হয় এমন কাজই করেন। বাবা বকা খেলে আমি আর রুবি খুশি হই। মা'ই সর্বেসর্বা। তার জন্যই তো আমাদের বেঁচে থাকাটা এত আনন্দের!

মায়ের আজ অপারেশন। রাতে। মামা আছেন সেখানে। অপু ভাই রক্তের জন্য ছোটাছুটি করছে। সব নিয়ে তৈরি থাকতে হবে। কোথাও এক চুল ছাড় দেওয়া যাবেনা। মাকে হারানোর প্রশ্নই ওঠেনা। বরিশালে আজ মসজিদে বিশেষ দোআর ব্যবস্থা করা হবে। আত্মীয় স্বজন সব আমাদের বাড়িতে। সকালে মামাকে কল দিয়েছিল বাবা। তিনি বলেছেন। জায়নামাজ ছেড়ে আজ আর উঠবেন না। অপারেশন শেষে মামাকে জানাতে বলেছেন।

আমি এক অকর্মার ঢেঁকি। আমাকে দিয়ে ইবাদতও হয়না ঠিকমতন। পাসপোর্ট অফিসের বাইরে জ্বর শরীর নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে আমি কি'ই বা করতে পারি। আয়াতুল কুরসি পড়া যায়। মুখস্ত আমার। এদিক ওদিক পানি খুঁজি। জিজ্ঞেস করে পেয়েও যাই। অযু করি। ফিরে এসে আগের জায়গায় বসে পড়ি, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুমু লা তা খুজুহু সিনাতুয় ওয়ালা নাউম...।' পড়তে পড়তে চোখে পানি আসে। 'আল্লাহ গো, আমার মাকে খুব দরকার, রুবিরও দরকার। আমাদের সবার দরকার। তার হায়াত বাড়ায়ে দিতে আপনিই পারবেন। আল্লাহ...।'
'যেতে হবে। সংবাদ ভালো না। দেখি তবু কি করা যায়। চল।' বলে সন্দীপ মুখার্জি। ঘর থেকে বের হয়েছেন তিনি। কখন টের পাইনি। থমথমে মুখ লোকটার।
'আচ্ছা। আচ্ছা।' আমি টলোমলো পায়ে জ্বর শরীর নিয়ে উঠে দাড়াতে চেষ্টা করি।
'কি হলো? শরীর ঠিক।' আমাকে দেখে বলেন তিনি।
'হুম। হুম। একদম ঠিক।' আমি জ্বর, ক্লান্তি থোড়াই কেয়ার করে সটান হয়ে দাড়াই। সৈনিকের মতন টানটান। শরীর খারাপ এটা কাউকে বোঝানো যাবেনা। এখন এইসবের সময় না।
'হাসপাতালে নামাবো?'
'জ্বি।'
'চলো। গাড়িতে কথা হবে।' বলে তিনি হাটা শুরু করেন। তার হাটার সাথে তাল মেলাতে কষ্ট হয়।
গাড়িতে উঠি আবার। গাড়ি চলতে শুরু করতেই তেলের গন্ধ নাকে ধাক্কা মারে। এই গন্ধ জ্বর শরীরে সহ্য হয়না। আমি বমি করি। বমি করে ভাসিয়ে দেই চারপাশ।
সন্দীপ মুখার্জি আমার প্রতি বিরক্ত হন। সেটাই স্বাভাবিক।
তবে বিরক্ত হয়ে তিনি আমাকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে যাননা। তার লোকজন গাড়ি পরিস্কার করে। আমাকে লেবুর শরবত এনে খাওয়ায়। একটু সুস্থ হলে পরে নামিয়ে দেয় হাসপাতালের সামনে।
বিদায় নেবার সময় সন্দীপ মুখার্জি কিছু বলেন না। বলবেন এটাও আশা করিনা। আমি তাকে বলেই কোটারি হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে পড়ি।
মা আজকে কেবিনে। এর মধ্যেই তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মায়ের সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অপারেশনের আগে কথা বলা সম্ভব হবে কিনা জানিনা। তার জ্ঞান আছে কিনা এটাও জানা নেই।
মামা আর রুবিকে দেখি। মামা আর বাসায় যাননি। হাসপাতালেই আছেন। আজ সবাই এখানে থাকবো রাতে। সবাই বলতে আমি আর মামা। রুবি ছোট মানুষ। তাকে হাসপাতালে রাখা ঠিক না।
'কোন খবর আছে?' মামা বলে।
'না। পাসপোর্ট এর কোন সল্যুশন নাই আর আকাশ মামাকে পেয়ে ছেড়ে দিছি।'
'আমার বোনটার কপাল এত খারাপ কেন রে?' মামা বলে। তাকে খুব শান্ত মনে হয়। পাথর পাথর মনে হয়। পাসপোর্টের ব্যাপারে কোন সমাধান আসলো না এটা নিয়ে তাকে চিন্তিত হতে দেখিনা। কিভাবে দেশে যাবো এখন? আকাশ লোকটার কাছ থেকে তো কিছু উদ্ধার হলোনা। বড় বিপদের ঝাপটায় উড়ে যায় ছোটখাট বিপদ সব। এখন অপারেশনের সময়। মা ছাড়া আর কিছু ভাবনায় আসা উচিত না।
'মায়ের জ্ঞান আছে?'
'না। নার্স তো তাই বলে। আজকে কারো সাথে আর দেখা করতে দেবেনা মনে হয়। ডাক্তারও পাচ্ছিনা সকাল থেকে।'
'কি বলো?'
'চেষ্টা করছি কয়েকবার দেখা করার। উনি সময় দিতে পারে নাই। বলছে, সময় হলে কথা বলবে।'
'রুবিরে তো দিয়ে আসতে হবে।' আমি বলি।
'না। রুবি এখানেই থাকবে।'
'হাসপাতালে? কিভাবে মামা? ছোট মানুষ?'
'যার মা এমন অসুস্থ তার ছোট থাকা চলেনা আর বুনোরা আমাদের বের করে দিছে। তুই তো সন্দীপ মুখার্জির সাথে ছিলি। জানাতে পারি নাই। দুইটা মাত্র লাগেজ। আমি আর রুবি লাগেজ নিয়ে সোজা চলে আসছি হাসপাতালে। লাগেজ রাখা আছে হাসপাতালের এক স্টাফ এর কাছে। কিছু রুপিও দিছি খেয়াল রাখার জন্য।' মামা কথাগুলো বলে।
'কোন ভালো খবর আছে মামা?' আমি হাসি। শুকনো হাসি হেসে কথাগুলো বলি।
'আছে তো। রুবির খাওয়া শেষ। সে বলছে লক্ষী হয়ে থাকবে। মায়ের অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন আবদার করবে না।' মামা হাসে। এই হাসিতে প্রাণ নেই। রুবিও হাসে। তারপর আমরা বসি চেয়ারে।
মা আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। আর আমরা তিনজন এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছি হাসপাতালের ওয়েটিং চেয়ারে।

বুনো কেন বের করে দিল সেটা নিয়ে ভাবার সময় নেই। সময় নেই বের করে দেবার পর কই গিয়ে উঠবো সেই হিসেব করার। এখন শুধু অপেক্ষা।
এই অপেক্ষা দীর্ঘ না হোক। দীর্ঘ না হোক।

১৪.

মাটির বুক চিড়ে,
যাওয়া যাক গভীরে।

সন্দীপ মুখার্জির সাথে আছি।
তিনি বললেন, 'ভালো ঝামেলায় ফেলেছ তো ছেলে।'
আমি হাসলাম। তিনিও হাসলেন।
বললাম, 'কয়েকটা দিন মাত্র।'
তিনি বললেন, 'থাকো। যে কয়টা দিন থাকার ইচ্ছে।'
মায়ের অপারেশন সফল হয়েছে। বারো ঘন্টার অপারেশন। অনেক কাটাকুটি হয়েছে। মায়ের জ্ঞান ফেরেনি। হুট করেই চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অপারেশনটা করবার। তার সিদ্ধান্ত ভুল না সঠিক সেটা বিচার করবার সময় এখনও আসেনি মনে হয়।
সন্দীপ মুখার্জির বাড়িতে এসে উঠেছি। কেন জানি আমার মনে হল এত বড় শহরে তিনিই এখন এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে আপনজন, শুভাকাঙ্খী।
হাসপাতালে মামা আছে। মায়ের কখন জ্ঞান ফিরবে ঠিক নেই। জ্ঞান ফেরার পরপরই মামা চায় তার বোন তাকে দেখুক। আমি মাকে দেখেছি। আউসিউতে কাঁচের আড়ালে। কি সুন্দর বোকাসোকা একটা চেহারা। কেন জানি মনে হয় সবাই স্মার্ট হচ্ছে, চালাক হচ্ছে কিন্তু আমাদের মায়েরা সেই সাধাসিধেই আছে। কেমন বোকা বোকা আর মায়া মায়া। খালি ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।
মাঝ দুপুরে নীল আকাশে দুনিয়ার মেঘ। নীলের আড়াল হতে উঠি উঠি করছে মেঘগুলো। এক এক সময় একেক শেপে আসছে তারা। গোপন নিড়ানি দিয়ে মেঘের শরীর কেটে কেটে শেপে আনছে কেউ একজন যেন। সূর্যের আলো নিস্তেজ, ক্লান্ত।
চোখে আসে এসব। যেখানে বসে আছি তার পাশেই পুরনো দিনের বাড়ির মতন মস্ত জানালা। গ্রিল নেই।
'মাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে?' বলেন সন্দীপ মুখার্জি। তাকে দেখে মনে হয়না তিনি এ ধরনের আলাপ সচরাচর করেন। আমার প্রতি তার করুণার কারন জানা নেই।
'জ্বি হচ্ছে।'
'ভগবান ভালো করবেন। এখন যাও। আমার ব্যস্ততা আছে আর যতদিন থাকতে চাও থাকতে পারো তবে হ্যা আজীবন থাকার প্লান কোরোনা।' বলে হাসেন সন্দীপ মুখার্জি। সুন্দর হাসি। ক্ষমতাবান খারাপ মানুষ এই লোকটার ভালো এ দিকটা চোখে পড়েনি কখনও।

কথা বলে সন্দীপ মুখার্জি চলে যান। আমি বসে থাকি বৈঠকখানার ঘরটায়। রাজ্যি মানুষ আসছে যাচ্ছে এই ঘরে। নিজেদের কাজ সেরে নিচ্ছে। আমাকে নিয়ে কারো কোন মাথাব্যাথা নেই। ঘরে অচেনা একটা আছে যে সেটা কেউ খেয়াল করছেনা।
একটা লোক এসে খাসির মাংস আর রুটি দিয়ে যায়। সাথে পানি আর লাড্ডু। আমি খেয়ে নেই। হাসপাতালে যেতে হবে। মামার পাশে গিয়ে বসতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে মায়ের জ্ঞান ফেরার।
বাবার সাথে কথা হবে আজ। লোকটা বুড়িয়ে গিয়েছে। বয়স কিন্তু বেশিনা। মধ্যবিত্ত বাবাদের চল্লিশ এর পরেই মৃত্যুচিন্তা ঢুকে যায় মাথায়। তারা ভাবে আমি মরে গেলে পরিবারটার কি হবে!
মাথায় তার হাজারো দুশ্চিন্তা। শেষ যেদিন কথা হয়েছে সেদিন বাবাকে স্বাভাবিক মনে হয়নি আমার। কেমন থেমে থেমে কথা বলছিল। মনে হচ্ছিল অনেক কথা রেখে দিয়েছে ভেতরে। যা বলছে সেটা অল্প, সামান্য। না বললেই নয় এমন কিছু।
খেয়ে বের হই বাইরে। হাসপাতালে যাবার আগে একবার বুনোর বাসা হয়ে যাওয়া দরকার। ওর বাসায় আমার কাপড়-চোপর আছে কিছু। আগের দিন মামা নিয়ে আসতে পারেনি সব। আজ গিয়ে বুনোর সামনে পড়তে চাইনা। এখন বুনোর বাসায় থাকার কথা না। সেই হিসেব করেই যাচ্ছি। বুনো কেন বের করে দিলো, আমার-আমাদের অপরাধ কি ছিলো এই কাসুন্দি ঘাটার ইচ্ছে নেই।
সব হিসেব নিকেশ চুকানোর সময় চলে এসেছে। বুনোকে নিয়ে পড়ে থাকলে আমার হবেনা। আমাকে ভাবতে হবে আমার পরিবার নিয়ে। সম্পর্ক বাড়ানোর জটিলতায় এখন আর যাওয়া আমাকে মানায় না।
পুরো কোলকাতা জুড়ে আজ ধুন্ধুমার জ্যাম। নেমে ট্যাক্সি নিয়ে নেই। পৌঁছাতে একটু সময় লাগে। বুনোর বাসায় ঢুকেই দেখা হয়ে যায় বুনোর মায়ের সাথে। আমাকে দেখে বলেন, 'তোমার কিছু কাপড় আছে। গুছিয়ে রেখেছি আমি। নিয়ে যেও আর শোন আমি কিন্তু চাইনি তোমার মায়ের এমন অবস্থায় তোমাদের যেতে বলা হোক। সত্যি বলছি আমি।'
আমাদের বের করে দেবার জন্য বুনোর মাকে একটু অপরাধী মনে হয়। তিনি আমাকে ভেতরে বসতে বলেন। বসতে না বসতেই চা আর বাসি বিস্কুট আসে। অপরাধবোধ থেকে করা বুনোর মায়ের এই কান্ড দেখে আমার হাসি পায়।
চায়ের চুমুক দিতেই ভেতরের ঘর থেকে বুনো এসে হাজির হয়। ভিমড়ি খাবার দরকার ছিলো হয়তো আমার কিন্তু খুব স্বাভাবিক থাকি। বুনো এসে আমার পাশের সোফাটায় বসে। তারপর একটু থেমে কথা বলা শুরু করে।
'জ্ঞান ফিরলো তোমার মায়ের?'
'না। এখনও না। তোমার তো জানার কথা।' চায়ে চুমুক দিয়ে বলি। চায়ে চিনি ভর্তি। শরবতের মত লাগে।
'হাসপাতালে যাইনি তাই জানিনা। শরীরটা ভালো না। মেয়েলি ব্যাপার।'
'ও।' কি বলা উচিত না বুঝে পেয়ে এই সামান্য 'ও' শব্দটা দিয়ে আলাপ শেষ করার চেষ্টা করি।
বুনোর শরীর ভালো না সেটা বোঝা যাচ্ছে। একদিনেই চোখের নিচে গাড় হয়ে কালশিটে পড়েছে। মাথার চুল এলোমেলো। রক্তবর্ণ চোখ। মনে হয় অনেক ঝড় ঝঞ্চার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।
'তোমাদের অইদিন বের না করে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলোনা।'
'ঠিক আছে তো। তোমাদের বাসা। তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমতনই তো সব করতে পারো। এতে দোষ নেই।'
'আমি জানি ভুল বুঝেছ তুমি আমাকে।' কথার মাঝখানে ভেঙে ভেঙে কাঁশি দেয় বুনো। শরীর ভালো নেই মেয়েটার মানতেই হয়।
'এই নিয়ে আর কথা বলতে হবেনা। তোমার শরীরও খারাপ মনে হচ্ছে।'
'না আমি বলবো। বলতেই হবে। ঠিক আছি আমি। আমাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।' চেঁচিয়ে বলে বুনো। তার মা ছুটে আসে আওয়াজ শুনে। কিন্তু এসেই বুনোকে দেখে ভয় পায়। বুনোর রাগ, ফুলে ওঠা চোখ-মুখ দেখে তার মা ঘাটানোর সাহস পায়না।
ঘরে শুধু আমি আর বুনো। টেবিলে চায়ের কাপটা রেখে আমি কথা বলি।
'বলো যা বলতে চাও। আমার তাড়া আছে। হাসপাতালে যেতে হবে।'
'রজত দেশে ফিরতে রাজি।'
'তোমার ছেলে বন্ধু?'
'হুম। মানুষটা ভালো ও। আমাকে অন্ধের মতন ভালোবাসে। তাই হয়তো কোনদিন জরুরী কিছু মনে করিনি ওকে। কাছের মানুষগুলোর মূল্য আমরা বুঝিনা।' এইটুকু বরে একটু থামে বুনো। তারপর আবার কথা শুরু করে।
'রজতের ফিরে আসার শর্ত হচ্ছে তোমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করা। ওর কথাতেই আমি অস্থির হয়ে তোমাদের বের করে দিতে বাধ্য হয়েছি। ও টের পেয়েছে সব। তোমার আর আমার ভেতরে ঘটে যাওয়া সবকিছু ওর জানা। আমিও লুকানোর চেষ্টা করিনি কিছু ওর কাছে এবার। সব বলে দিয়েছি। ওর সাথেই যেহেতু সামনের দিনগুলো কাটবে তাই লুকোছাপায় যাওয়া ঠিক হবেনা।
'ভালো তো।' আমি বলি।
'আরো কথা আছে। আমাকে শেষ করতে হবে। শেষ করতে দাও। এরপর কথা বোলো তোমার যা বলার।' বলে বুনো। অনেক অস্থির মনে হয়। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার বোঝা যায়। আচমকা ওর চারপাশে বাতাসের যেন কমতি পড়েছে। আমি শুনে যাই। ও যা বলছে সেখানে আমার বলার কিছু নেইও। কিংবা বলাটাও ঠিক হবেনা।

‘আমার তো কোন অবলম্বন নেই আর। আমার কিছু করার ছিলোনা। ভুল না বোঝ যেন তাই বললাম। রজত ফিরবে শীঘ্রই। আমি সবকিছু ঠিকঠাক চাই আর তোমার সাথে যোগাযোগও রাখতে চাইনা।
‘আমি কিন্তু তোমাকে জোর করিনি। তুমিই বরং...’ আমি কথা শেষ করতে পারিনা তার আগেই বুনো আবার বলা শুরু করে।
‘জানি আমি। অপরাধ আমার স্বীকার করেও নিচ্ছি। ভালো থাকো। তোমার মা সুস্থ হোক আর যতদিন দেশে আছো কোন কাজে লাগলে আমাকে বললেই ছুটে আসবো।’ বুনোর চোখে জল।
‘আমার কিছু বলার নেই।’ বলে আমি ওঠার জন্য সোফা থেকে উঠে দাড়াই। আমার ভেতরের পুরুষটা কেমন যেন স্বার্থপর হয়ে ওঠে। রজতকে সহ্য করতে পারেনা। আমি অপেক্ষা করিনা। বের হয়ে যাই। জোরে জোরে হেটে সোজা পৌঁছাই হাসপাতালে। বুনোকে নিয়ে অনেক হয়েছে। এসবের অবসান হোক এখন। বুনোর আর রজত ভালো থাকুক। সবাই ভালো থাকুক। আমার এসবে দরকার নেই। আমি শুধু নিজেরটা ভাববো। মা, রুবি আর বাবার কথা ভাববো। ব্যাস্।
হাসপাতালে মামার সাথে দেখা হয়। মামা জানায়, মায়ের জ্ঞান ফেরেনি এখনও। তাকে বলি বাসায় যেতে। শোনেনা। বোনের জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত সে কোথাও নড়বে না এই তার এক কথা।
আমি জোরাজুরিতে যাইনা। মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিয়ম নেই। অপু ভাই আসবে একটু পর। আমি মামাকে এই কথা বলে আবার হাসপাতালের নিচে নামি। বাবার সাথে কথা বলতে হবে। টেলিফোন বুথ থেকে কল দেই। আমার কিছুই ভালো লাগেনা। কেউ যদি আমাকে একটু ভালো থাকার, ভালো রাখার আশ্বাস দিতো!
‘তোর মা কেমন আছে?’ হ্যালো না বলেই টেলিফোনে ওপাশ থেকে কথা শুরু করে বাবা।
‘জ্ঞান ফেরে নাই।’
‘ফিরবে বলে মনে হয়?’
‘এটা কি ধরনের প্রশ্ন বাবা?’ আমি বলি। বাবার প্রশ্ন শুনে অবাক হই।
‘তোকে আমার একটা বলতে হবে।’ কাঁপা কাঁপা কন্ঠ বাবার।
‘বলো।’ আমার বিরক্ত লাগে।
‘ঠিক সময় এখন কিনা জানিনা কিন্তু তুই বাড়ির বড় ছেলে তাই তোর জানা দরকার।’
‘এমন ভনিতা করছো কেন বাবা? তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। ঝামেলা কোন?’ আমার অস্থির লাগে।
‘তোর ওখানে আছে...ও তো দেখা করেছে তোদের সাথে।’
‘কার কথা বলছো? তোমার বান্ধবী?’
‘ওর সাথে আমার একটা সম্পর্ক। তুই এখন বড় হয়েছিস...। তোর মায়ের ঠিক নাই...।’ এতটুকু বলতেই থামিয়ে দেই আমি।
‘বুঝেছি বাবা। ঠিক আছে। আমি ফোন রাখি হ্যা? পরে কথা বলবো। মাকে দেখতে হবে। দেখার মানুষগুলো কমে যাচ্ছে তো।’ এটা বলেই ফোন রাখি। ওপাশে বাবার কথা শোনার জন্য আর অপেক্ষা করিনা।
আমার ভেতরে কিছু হয়না। অস্থির হবার কথা ছিলো। হইনা।
ধীরে ধীরে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে হয়তবা। আবার মামার কাছে যাই। মামা ক্রিটিক্যাল কেয়ারের সামনে দাড়ানো। ভেতরে মা। দেখা যায়না। ঝাপসা আধুনিক কাচের জানালার ওপাশে দাড়িয়ে থাকি আমি আর মামা। পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায়, নিরীহ মানুষদুটো।
‘কথা হয়েছে তোর বাবার সাথে?’ বলে মামা আমার দিকে তাকিয়ে।
‘হ্যা।’
‘কি বলে?’
‘মায়ের খবর জানতে চাইল।’
‘ও আচ্ছা।’
এরপর আর কথা হয়না। আমি স্বাভাবিক থাকি। আমাকে দেখে কিছু বোঝা যায়না। বাবার বিষয়টা নিয়ে কথা বলার সময় এখন না। সব ভেঙে যাবে। সবকিছু ভেঙেচুড়ে শেষ হয়ে যাবে। সে ঝুকি আমি নিতে পারবো না। সে চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে বাবা কথা দিয়ে কথা রাখলো না। আমার মনে পড়ে। সব মনে পড়ে যায়। তখন ভুতের ভয় ছিলো। স্কুলে পড়ি। শেষ রাতে ঘরের ভেতর অন্ধকারে কালো একটা মানুষের অবয়ব দেখে ভয় পাই। চিৎকার করে কেঁদে উঠি। বাবা ছুটে আসে পাশের ঘর থেকে। লাইট জ্বালাতেই দেখা যায় মানুষ টানুষ কিছু না। একটা চেয়ারের ওপর তোয়ালেটা এমন ভাবে রাখা ছিলো যে অন্ধকারে মানুষের শরীর বলে ভুল হয়েছে। ভয় যায়নি আমার। একা ঘুমাবো না বলে কাঁদছিলাম। বাবা সেদিন আমার সাথে ঘুমায়। বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে থাকি। বাবা বলে, ‘আমি আছি না? আমি থাকতে ভয় পাবিনা কোনদিন। সব ঠিক করে ফেলবো। তুই, তোর মা সবাই ভালো থাকবি। তোদের দেখার দায়িত্ব আমার। কোন ভয় নাই। এবার ঘুমা।’

কথা রাখেনি বাবা। আমাদের দেখার দায়িত্ব থেকে সে দূরে সরে গেল। ভাবলো শুধু নিজের কথা। কথা দিয়ে কথা না রাখার মতন কঠিন অপরাধ করলো। আমার এসব অভিমান হয় এ মুহূর্তে। কি হাস্যকর! কত কতদিন আগের ছেলের ভয় ভাঙানোর জন্য এমনি বলা কিছু কথা এই সময়ে মনে পড়লো। পরিস্থিতি বুঝে মাথার ভেতর কথার পোকারা আসে।
মা সুস্থ হলে কিভাবে বলবো আমি বাবার কথাটা।
মা আমার বাঁচবেনা। তখন বেঁচে গেলেও বাঁচবেনা।
যন্ত্রনা। কি অসহ্য যন্ত্রনার চারপাশ।
সবকিছু ধ্বংস হয়না কেন?
ধ্বংস হোক।

১৫.

ভুল পথে গেলে গাড়ি,
শোনা যায় আহাজারি।

কোনো ওষুধই মায়ের শরীরে কাজ করছে না।
ডাক্তারের মুখ শুকনো। তিনি টেনশনে আছেন বোঝা যায়। কুচকানো কপাল আর ঘোলাটে চোখ জানিয়ে দেয় যে তিনি বিভ্রান্ত। আমার এসব মুখ চেনা। এসব আমাকে আর ভীত করেনা। আমি বুনোর ছেলেবন্ধুটার কথা ভাবি। ভাবি বুনোর কথা। বুনো ঠিকই করেছে। তার ছেলেবন্ধুর কাছে ফিরে গিয়েছে। যে ডাকে ভালোবাসা আছে সে ডাক অগ্রাহ্য করা কঠিন অপরাধ। বুনো এই অপরাধে দোষী হয়নি আর। সবার এমন ভাগ্য হয়না। আমরা সবাই ভালোবাসা পাবার মতন ভাগ্যবান নই। ভালোবাসাহীন এক জীবন কাটিয়ে দেবার মানুষ আছে অনেক।
মায়ের জ্ঞান ফিরেছিল। এটা মামার দাবি। সে নাকি চোখের পলক ফেলতে দেখেছে। ডাক্তার মানতে নারাজ। মায়ের শরীরের অঙ্গগুলো ধীরে ধীরে কাজ করা ছেড়ে দিচ্ছে। বেঁকে বসেছে। অনেক তো হলো। এবার চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নেবার পালা।
ডাক্তার বলছে জ্ঞান ফিরবে। হাল ছাড়তে নেই। মামা ডাক্তারের কথা আমলে নিচ্ছেনা। তিনি হৈ চৈ বাঁধানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই ডাক্তার নাকি ডাক্তারির 'ড' ও জানেনা। তার বোনের যদি কিছু হয় তাহলে তিনি কাউকে ছাড়বেন না। আচমকা তার কাছে পুরো শহর আর শহরের মানুষগুলোও খারাপ হয়ে গেছে। দেশে থাকলেই নাকি ভালো হত। বোন ভালো থাকতো।
রুবির জ্বর আজকে। ঠান্ডা লেগেছে। শুকনো কাশি। বুকের ভেতর কফ জমেছে। খুব কষ্ট করে কাশি দিচ্ছে মেয়েটা। আমি মধু পানির সাথে গুলিয়ে রুবিকে খেতে দেই। রুবি চুপচাপ খায়। একটা কথাও বলেনা। সে চেষ্টা করে কাশি না দিতে। লাভ হয়না। খুক খুক আওয়াজ হয়। মেয়েটার কষ্ট হয় আরো বেশি। পুতুলের মতন বোনটা আমার।
তার জন্য চকলেট কিনে আনবো কিনা জানতে চাই। সে বলে, লাগবে না। মায়ের জ্ঞান ফিরলে পর সে চকলেট খাবে। এর আগ পর্যন্ত কিছু না। মায়ের জ্ঞান ফেরাটা দরকার। অন্তত রুবির সাথে কথা বলার জন্য দরকার। রুবির বয়স কত? ও তো খুব বেশিদিন পায়নি মাকে। ওর কি আরও কিছুদিন মাকে কাছে পাওয়া উচিত না।

মামা বাবার সাথে কথা বলেছে। বাবা নাকি ফোনে কেঁদেছে মায়ের জন্য। হাউমাউ করে কেঁদেছে। মামাও কেঁদেছে। শালা-দুলাভাইয়ের কান্না।
বাবাকে নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি আর তার সাথে কথা বলিনি। জীবনে আর কোনোদিন কথা বলার প্রয়োজন হোক এটাও চাইনা।
আমরা থাকা অবস্থায় ডাক্তার কয়েকবার এসে সিসিইউ তে গিয়ে মাকে দেখে এসেছে। প্রতিবারই দেখেছি শুকনো মুখ নিয়ে বের হচ্ছে। কিছু আর জিজ্ঞেস করিনি আমি তাকে। মামাও না।
অপু ভাই এসেছে। এসেই জানাল সন্দীপ মুখার্জি আসবে হাসপাতালে। মায়ের খোঁজখবর নেবে। এই লোকটা এসব কেন করছে, এতটা কেন করছে তা জানিনা। শুধু কৃতজ্ঞতা জানাই মনে মনে।
কালাই রুটি দরকার। মাষকলাই আর চাল দিয়ে তৈরি রুটি। সাথে থাকবে বেগুন ভর্তা, কাঁচা মরিচের ভর্তা আর ধনে পাতার রস। মা একটা কালাই রুটি খেয়ে শেষ করতে পারেন না। বাকিটা আমাকে খেতে হবে। তিনি বলেছিলেন, 'মরার আগে আমার পাশে থাকবি কালাই রুটি নিয়ে। বানেশ্বর দিয়ে রাজশাহী যাওয়ার পথে খাওয়া হইল। কি স্বাদ!'
মায়ের প্রতিটা ইচ্ছা আমার পূরণ করতে ইচ্ছে করে। মা মনে হয় মারা যাচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি। সকালে নিজের ঘরের জানালার কাঁচ আচমকা চুরমার হয়ে গেল। আসার পথে কালো বেড়াল। শুনতে হাস্যকর। যার মা মৃত্যুশয্যায় তার এমন হাস্যকর কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থাকলে দোষ নেই। ক্ষমা করা উচিত।
আমার ভেতরে কেমন কষ্ট হচ্ছে। দলা পাকিয়ে ভেতর থেকে বাইরে আসতে চাচ্ছে কান্না, কান্নার জল।
'ভরসা রাখ। তুই বড় ছেলে। ভাঙবি না। কত কি মিরাকল হয়। একদম হাল ছাড়বিনা।' বলে অপু ভাই। বলার সময় তার গলায় জোর পাইনা। বলার জন্য বলা। আমি মুচকি হাসি।
'কি হবে তুমি তো জানো।' বলি আমি।
'না। জানিনা। সবকিছু জানে আমরা যার সৃষ্টি তিনি। মানুষ অতি তুচ্ছ, সামান্য। তার এত কিছু ক্ষমতা হয়নি এখনও। হবে বলেও মনে হয়না।' অপু ভাইয়ের মুখে কঠিন সব কথা।
মানুষ বিপদে পড়লে ধর্মে কর্মে মন বেড়ে যায়। এর আগ পর্যন্ত নিজেকেই মনে হয় সর্বেসর্বা। সন্দীপ মুখার্জি আসেন নি। মামা করিডরে আমার কাছে এসে কথা বলে।
'রুবিকে নিয়ে তুই বাড়ি যা। ওর শরীর ভালো না। এখানে থাকলে মায়ের জন্য মন খারাপ হবে। ছোট মানুষ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটু পরপর।'
'এখানেই থাকুক। মায়ের যদি জ্ঞান ফেরে?' আমার হাল ছাড়তে ইচ্ছা করেনা। দূরে দূরে অনেক দূরে অন্ধকারের ভেতর আশার বাতি জ্বলছে যেন।
'তোর বাবার সাথে কথা হয়েছে একটু আগে। দেশে কিভাবে ফেরা হবে এটা নিয়ে আলাপ হলো অনেকক্ষন। বেনাপোল দিয়ে ঢুকতে হবে। সন্দীপ মুখার্জির কাছে সাহায্য চাইবো?'
'আমার মা কি মারা গেছেন?' চিৎকার করে বলি আমি।
'না।'
'তাহলে এসব কি হচ্ছে? দেশে যাবো মানে?'
'শান্ত হ। আমি আর অপু দেখতেছি সব। রুবি থাকুক তোর সাথে।'
'যা বোঝো করো। আমার মা যেন ঠিক থাকে।' শাসানোর মতন করে বলে আমি হাসপাতালের নিচে যাই। রুবি থাকে মামার সাথেই।
বুনো আজ আসেনি। অ্যাকাউন্টস এ গিয়ে দেখি টেবিল খালি। আমি চুপ করে একটা চেয়ারে বসে থাকি। ক্লান্ত লাগে। কেমন শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে। ঘুম পায় খুব।
আমাদের 'আপন ভিলায়' এখন রোদ এসে পড়েছে মনে হয়। তেরছাভাবে সূর্যের আলো থেকে আসা রোদ ওম ওম গরমে উষ্ণ করে তুলছে নিশ্চয়ই বাড়িটা। আশে পাশে বাড়ি কাজ হয় এসময়ে। তাই ট্রাক আসে যায় খুব। বালি ভর্তি, ইট ভর্তি ট্রাক। ধূলোয় ঢাকা পড়ে বাড়িটা। সুযোগ পেলেই তারা রং, তামাশা করে হাওয়ার সাথে। ধূলোয় ঢেকে যায় তখন বাড়িটা। নিশ্বাস নেওয়াই কষ্ট হয়। এসব সময়ে সবাই মিলে ঝাড়পোছ করে বাড়িটা আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতাম। রুটিন মেনে সাফ সুতরোর কাজ করতাম। মায়ের ধূলো সহ্য হয়না। অ্যাজমারও সমস্যা। ইনহেলার না হলে বিপদ। আজ কি 'আপন ভিলা'র মন খারাপ?
'আপন ভিলা'র চারপাশের মাটি, প্রতিটা গাছ, আগাছা, দুপুরবেলা পথ ভুল করে বাড়ি ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিটারও নিশ্চয়ই আজ শোকের দিন। তারা কি জানে এ বাড়ির কর্ত্রী বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। এমন লড়াই যে লড়াইতে হেরে যাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই বলেই মনে হচ্ছে।

আমার জীবনটাকে নিয়ে আমার খুব ভাবতে ইচ্ছা করে। গোছাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হয়না। কারো কারো জীবন গোছানোর জন্য নয়। এত এত কষ্ট, দুঃখের ভিড়ে আনন্দের মুহূর্তগুলোকে, নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় গুলোকে আলাদা করে ঠাওর করা যায়না। কেমন জট পাকায়। এক দিক দিয়ে গোছানো শুরু করলে আরেক দিকে ভাঙতে শুরু করে।
কার কাছে যাবো আমি রুবিকে নিয়ে। মা না থাকলে আর বাবার কাছে যেতে চাইনা। চাচারা রাখবেনা। মামা হয়ত না করবেনা কিন্তু কতদিন? নিজের কিছু করতে হবে। বোন রুবিকে ঠিক রাখতে হবে।
'ভগবানকে ডাকো।' বুনোর এক মেয়ে কলিগ পাশে এসে কথা বলে। হাতে কফি। আমাকে সাধার প্রয়োজন মনে করেনা। এদের এসব ব্যাপারে কার্পণ্য দেখা যায়।
'বাঁচবেন?' আমার এই সময়ে সবার কাছ থেকে এই একটি প্রশ্নের উত্তরই জানতে ইচ্ছে করে। কেউ একজন বলুক মা বাঁচবেন। বাঁচবেন।
'ভগবান চাইলে হবে। বুনো ছুটিতে জানো?' বলে মেয়েটা। মায়ের ব্যাপারে তার আগ্রহ নেই বোঝা যায়। তিনি অন্য কিছু বলতে চান। কথা শুরু করতে হবে তাই মায়ের ব্যাপারটা টেনে আনা।
'জানিনা।'
'ছোট খাটো একটা ধকল গেল মেয়েটার ওপর দিয়ে।' কফিতে চুমুক দেয় সে। চোখ দুটো চকচক করছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলবে মনে হয়। বলার পর আমি কি করি সেই নাটক দেখার জন্য তার অধীর অপেক্ষা।
'কি সমস্যা?' আমার মা সুস্থ নয়। আমি স্বার্থপর হই। এই মূহূর্তে বুনোকে নিয়ে কোন আগ্রহ নেই আমার। কিছু জানার ইচ্ছে নেই।
'ও বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলেছে। অ্যাবরশন। রাখার উপায় ছিলোনা। আর ওর বয়ফ্রেন্ডও মেনে নিয়েছে তোমাদের ব্যাপারটা। ক্ষমা করেছে।' কফিতে চুমুক দিয়ে বলে। যতটা নাটকীয়তা আনা যায় বলার সময় সে চেষ্টাটা করে।
'কার বাচ্চা?' আমি একটা ধাক্কার মতন খাই।
'তোমার।' বলে মেয়েটা। তাকে খুশি মনে হয়। আমার আঁতকে ওঠা দেখে, অবাক হওয়া দেখে নির্মম শান্তি পান।
এমন সময় অপু ভাই দৌড়ে আসে। তাকে হাঁপাতে দেখি। কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'কই ছিলি শালা? সারা দুনিয়া খুঁজেও পাইনা। তোর মায়ের শেষ অবস্থা। তাড়াতাড়ি।'
এরপর আমার দৌড়ানোর কথা। দৌড়ে মায়ের কেবিনের কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি তা করিনা। করতে পারিনা। হুট করে মনে হয় আমার চারপাশের অক্সিজেন কমে গেছে। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার ভেতরে হাহাকার তৈরি হয় বাতাসের জন্য। আমি নিশ্বাস নিতে চাই। কেউ একজন নাক আর মুখ বন্ধ করে রেখেছে কি? কানের ভেতর চিনচিন একটা শব্দ। আর কোন আওয়াজ নেই। হাত-পা ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে। আমি এই পৃথিবীতে আসি বলে মনে হয়না। সবকিছু ঝাপসা। অস্পষ্ট।
আমি পড়ে যাই মাটিতে। এতটুকুনই আমার খেয়াল আছে। এতটুকুনই মনে পড়ে।
বাকি সব অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

১৬.

আজগুবি জীবনের রেশ,
শেষ, শেষ, শেষ।

রেহেলে পবিত্র কুরআন শরীফ সাদা সিলকের গিলাফ দিয়ে ঢাকা।
গোলগাল একটা চাঁদ যাচ্ছে সাথে সাথে। গাছের পাতায় লেপটে আছে একটু একটু তার বরফ আলো। মনে হচ্ছে বরফের গুড়োয় তৈরি মোলায়েম এক জোৎস্নার শামিয়ানা টানানো রাতের শরীরে। একটা বিবাগী পাখির ডাক শোনা যায়। সো সো আওয়াজ বাতাসের। ছুরির মতন ধারালো মনে হয়। একটু একটু শীত। সব নিয়ে কেমন ঘোর লাগা চারপাশ।
মামার হাতে তসবিহ। রুবি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে পরিচিত একটা সূরা পাঠ করে। বেশি জানা নেই তার।
আমি পবিত্র কুরআন শরীফটা যত্ন করে পাশে রাখি তারপর ভাবার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি কি হচ্ছে, কি হল।
মাথাটা ফাঁকা লাগে আমার। ঘুম হয়নি গত রাতে। চোখটা জ্বলছে।
আমার মায়ের সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে। 'মা, ভালো আছো? কি করো?' মা জবাব দেয়না। দেবেও না। ঘুমিয়ে আছে। জবাব দেবে কি করে?
দেশে পৌছাতে পারলে চলে যেতে হবে গ্রামে। মায়ের গ্রাম। আমার নানাবাড়ি। সেখানেই মায়ের জন্য বিছানা পাতা হবে। মা ঘুমাবে। মেহগনি আর তেতুলের ছায়ায়। কবরের মাটির ওপর থাকবে মাদুর বিছানো আর নারকেল পাতার বসবাস। মায়ের আমার গ্রাম পছন্দ। 'আপন ভিলা'য় যাবেনা। ওর আশেপাশে থাকলে, ঠাই নিলে রুবির দেখলেই মন খারাপ হবে। ছোট্ট, রাজকন্যা মেয়েটার মন খারাপ চায়না মা। বলেছে,'আমারে গ্রামে মাটি দিস। কবরের পাশে গাছ লাগাবি। ছায়া-ছায়া, ঠান্ডা থাকবে। আমার গরম সহ্য হয়না বাবা।'
মায়ের কাছে দূরের গ্রামই ভালো। রুবি মাঝে মাঝে জিয়ারত করতে আসবে। তখন কাঁদবে একটু। মায়ের কবর জড়িয়ে শুয়ে থাকবে। খুব বেশি কাঁদতে নেই। এতে নাকি পাপ।
আমি মায়ের গ্রামটার কথা ভাবি। আমার নানাবাড়ি-দাদাবাড়ি পাশাপাশি। একই গ্রামে মানুষ হওয়া আমার মা আর বাবা।
অইতো খুব কম গিয়েছি গ্রামে। ভাসা ভাসা স্মৃতি। মায়ের কাছে শোনা গল্প বাকিটা।
আধবোঝা চোখে আমি গ্রামটাকে ভাবনায় দেখার চেষ্টা করি।
দেখি একটা নৌকার গলুইতে পানি উঠছে। ঘুড়িটা কাটা পড়ে। একটা গরু পানিতে নেমে পড়ে। একটা ন্যাংটো শিশু। মালাই, মালাই। কচি ডাবে দাএর কোপ। কয়লায় ঝকঝকে দাঁত। খেচইন জালে আটকে পড়া কচুরিপানা-চিংড়ি। পায়রার বাক বাক বাকুম। টক আমড়া। কাটা কলাগাছ। নদীতে ঝাপ। চোর কাটা। চুলকানি। গায়ে কাঁদা। গলে যাওয়া সাবান। কাঁচা খেজুর। কানে পানি। পান-চুন- জর্দা। আখের শক্ত পেলব শরীর। ভাঙা পুকুর ঘাট। বড়ই। গাবের কষ। নীল ফুল। মাগুর মাছ। আমৃত্তি। পিয়াজু। দানাদার। বাঁছা চাল। মুরগীর আদার। কেরোসিন। বাজার সদাই। ঠান্ডা-কাঁশি-সিকনি। মেজবান। সূর্য ডোবে। হ্যাজাক লাইট। নতুন ইমামের আযান। ডালে সুরুৎ করে চুমুক। গাতকের গান, 'মরি গেলি আর আইবা না...।'
এইতো গ্রাম। মায়ের কাছে শোনা, আমার চোখে কিছুটা দেখা গ্রাম। সে গ্রামে যাব।
মাকে রেখে আসবো। মায়ের গ্রাম। মা ভালোই থাকবেন। আমরা কেমন থাকবো?

গাড়ির জন্য অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করি দালালের জন্য।
সন্দীপ মুখার্জি দেশে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ঢোকা হবে। দু-পাশের লোকজনদেরই অনেক টাকা পয়সা দিতে হয়েছে। আমাদের জন্য এ সব কিছু করে দিয়েছেন সন্দীপ মুখার্জি। তিনি মানুষ যেমনই হোকনা কেন করুণাময় যেন তাকে ভালো রাখেন।
দুর্গম এক পথ দিয়ে যাত্রা। দালাল আছে সাথে। অনেকটা পথ হাটাহাটি। এরপর কিছুটা পথ গাড়িতে। কফিন নিয়ে ছোটাছোটি কষ্টের। সবাই বলছে মৃত্যুর পর ওজন বেড়ে গেছে মায়ের। লাশের ক্ষেত্রে এমনই নাকি হয়। মায়ের শরীরটাকে লাশ ভাবতে আমি রাজি নই। এই 'লাশ' শব্দটা নিয়ে আমার ঘোর সমস্যা।
মা আমার শুভ্র, সুন্দর, পবিত্র। মা আমার নিঃশ্বাস নেবার জায়গা। এই মা কখনো লাশের মতন নিথর হতে পারেনা। সম্ভব না। আমি একসময়ে ভেবেছিলাম মা বাঁচবেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমনটাই ভেবেছি। কিন্তু হয়নি। ভুলে গিয়েছিলাম যে মধ্যবিত্তদের জীবন খুব প্রেডিক্টেবল। ম্যাজিকাল কিছু হয়না। এ জীবনে শুধু টানাপোড়েন। কোন সুখের গল্প নেই। সফলতার গল্প নেই।
বুনোকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। বুনোর শরীরে আমার সন্তান এটা কিভাবে সম্ভব জানার সাহসও হয়নি। সম্পর্ক গড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সম্পর্কের দাবি তোলা। একরকম পালিয়েই এসেছি আমি। আমাদের চলে আসার খবর হয়তো হাসপাতালে এসে শুনবে ও অন্য কারো কাছে। বুনো ভালো থাকুক। ভালো থাকুক যে সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পায়নি সে'ও। আমি অপরাধী। কঠিন এ অপরাধের ক্ষমা নেই।
মাহবুবার সামনে দাড়াতে পারবো এরপর আর? এমন ঘটনাবহুল জীবন আমি চাইনি। চেয়েছিলাম দুই আর দুই যোগ করার মতন সোজা অংকের জীবন। তেমন হয়নি।
দালাল আসে। আমাদের পথ দেখায়। গাড়ি চলতে থাকে জোৎস্নায়। রুবি দেখি মায়ের কফিনের কাছে মুখ নিয়ে কি বিড়বিড় করে কথা বলে। আহারে। মেয়েটার জীবন জুড়ে আফসোস থাকবে মাকে অল্পদিন পেল এজন্য। বোন আমার।
গাছের আড়ালে যায় চাঁদ। আচমকা তুমুল অন্ধকার। বুক চিড়ে আসা কান্নাটা নিঃশব্দে কেঁদে নিতে চাই সামান্য সময়ের ভেতর। চোখে জল। ভেতরে মায়ের জন্য আহাজারি। জানি গাড়ির ভেতর থাকা রুবি আর মামাও এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কাঁদছে। আনন্দ লুকানো উচিত না। দুঃখ লুকানো থাক। তাই আমরা তিনজন অশ্রু লুকাই। দুঃখ লুকাই। এই দুঃখ ছড়িয়ে না পড়ুক। দুঃখ নিজের। একান্তই নিজের। নিজের দুঃখের জন্য আমি একটু কাঁদি। আমার, আমার মায়ের জন্য কাঁদি। আমার মা।
'মা, মা ও মা। মা গো, ও মা। মা'রে, একা হয়ে গেলাম। ও মা, মা, মা, মা...কই?।'
মা নাই। কেউ নাই। কিচ্ছু নাই।
কেমন অন্ধকার। কেমন শূণ্যতা।

----------o----------

লেখক পরিচিতি: মাটির মানুষ ছেলেটা তবুও আকাশে ডানা মেলে ওড়ার আজন্ম সাঁধ তার। - বুবু

কিঙ্কর আহ্সান এর বইয়ের ভুবনে আপনাকে স্বাগতম।
বই কিনুন। বইয়ের কথা ছড়িয়ে দিন। পৃথিবী বইয়ের হোক।